দ্বিতীয় অধ্যায়

শ্রেণীবিন্যাস ও শ্রেণী সংঘাত

দ্বিতীয় অধ্যায়

শ্রেণীবিন্যাস ও শ্রেণী সংঘাত

ভূমিকা ঃ- তারাশঙ্করের গল্পনিচয়ে শ্রেণীবিন্যাস ও শ্রেণীসংঘাত এ-পর্বে আলোচিতব্য। এই পর্বে আলোচনার নিরিখে চতুর্বিধ পর্বাঙ্গে আলোচনা করা যেতে পারে। যেগুলি যথাক্রমে ঃ-

(ক) ফিউডাল ভূমিব্যবস্থা।

(খ) ক্যাপিটালিষ্ট উৎপাদন পদ্ধতি।

(গ) ব্রাত্য শ্রেণী।

(ঘ) কৃষক আন্দোলন-তেভাগা আন্দোলন।

ইউরোপ

ক। ফিউডাল ভূমিব্যবস্থা ঃ- এই অধ্যায়ে সামন্ততন্ত্র, সামন্তবাদ ও সামন্তপ্রথা সম্পর্কে আলোচনা নিহিত। G. H. Sabine, Vinogradoff কে উদ্ধৃত করে বলেছেন, "Feudal institutions dominated the middle ages as completely as the city-state dominated antiquity" "প্রাচীন যুগের রাষ্ট্রচিন্তা যেমন নগর রাষ্ট্রকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছিল, ঠিক তেমনি মধ্যযুগের রাষ্ট্রচিন্তা একদিকে গির্জা বনাম রাষ্ট্র অন্যদিকে সামন্ততন্ত্রকে কেন্দ্র করে বিকাশ লাভ করেছিল।" (১)

বিভিন্ন রোমান ও টিউটনিক প্রথা ও প্রতিষ্ঠানের স্বাভাবিক পরিণতি হল সামন্ততন্ত্র। সমাজের উচ্চ ও নিম্ন উভয় স্তরেই সামন্ততন্ত্র প্রসার লাভ করেছিল। **"Feudalism was the natural outgrowth of many institutions and customs of Roman and Teutonic origin and grew from both the bottom and the top simultaneously"** (২) পিতৃতান্ত্রিক সমাজ ও সাম্রাজ্যবাদী রাষ্ট্রব্যবস্থা এই উভয় প্রতিদ্বন্দ্বীর মধ্যে সামন্ততন্ত্র একটা আপোষ রক্ষা করেছিল। রাজনৈতিক ঐক্যকে ক্ষুন্ন করে সামন্ততন্ত্র জাতীয় রাষ্ট্রের ধারণাকে ধ্বংস করে, সেই জন্যে মধ্যযুগে স্বাধীন জাতীয় রাষ্ট্র একরকম অজ্ঞাত ছিল। বিভিন্ন সময় ও ক্ষেত্রে সামন্ততন্ত্র অসমভাবে গড়ে ওঠার জন্যে এবং এর মধ্যে বৈচিত্র্যপূর্ণ প্রতিষ্ঠানের সমন্বয় ঘটার জন্যে সামন্ততন্ত্রের নিখুঁত সংজ্ঞা প্রদান একটা দুরূহ কাজ। তথাপি বলা যায় যে খৃষ্টীয় পঞ্চম শতাব্দী থেকে সক্রিয় থাকলেও ফ্রাঙ্কো সাম্রাজ্যের পতনের পরই সামন্ততন্ত্রের পূর্ণাঙ্গ বিকাশ শুরু হয় এবং একাদশ ও দ্বাদশ শতাব্দীতে সামাজিক ও রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান সমূহের উপর পূর্ণ প্রভাব অনুভূত হয়। সামন্ততন্ত্রকে বার্কি (Berki) একটা আর্থনীতিক বৈধ রাজনৈতিক ব্যবস্থা বলে অভিহিত করেছেন। **"(.....complicated economic legal political system is known as Feudalism)"** (৩)

অন্ধকারময় মধ্যযুগে রোমের সভ্যতা ও রোমীয় রাজনৈতিক আদর্শের অবলুপ্তি ঘটে। একদিকে গীর্জা, অন্যদিকে অভিজাত ও যোদ্ধৃবৃন্দ কর্তৃক শাসিত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র এলাকাকে কেন্দ্র করে সমাজের শ্রীবৃদ্ধি ঘটে। নবজাগরণের ফলশ্রুতি হিসাবে বহু প্রাচীন ধারণা ও প্রতিষ্ঠানের আবির্ভাব হয়, টিউটনীয় আদর্শে সেগুলি পরিমার্জিত হয়। এই পদ্ধতিতেই একরকম রাজনৈতিক জীবনের সঙ্গে পরিচিত হই, যাকে সাধারণভাবে বলা যায় সামন্তবাদ। অনুন্নত অর্থনৈতিক জীবন ও ভৌগোলিক কারণে টিউটনরা নগর রাষ্ট্র অপেক্ষা গ্রাম্য সংগঠনের উপর গুরুত্ব দিতেন। রাষ্ট্রের সার্বভৌমত্বের পরিবর্তে তাঁরা ব্যক্তির উপর গুরুত্ব আরোপ করেছিলেন। ব্যক্তিগত আনুগত্যই ছিল কর্তৃপক্ষের ক্ষমতার ভিত্তি। দক্ষতা, বীরত্ব, কর্মকুশলতার ভিত্তিতে জনগণ নেতাদের মনোনীত করতেন। **"Their system emphasised the importance of the individual as opposed to the sovereignty of the state."** (৪)

কেন্দ্রীয় শাসকের অভাবে শক্তিশালী ব্যক্তির হাতে রাজনৈতিক ক্ষমতা চলে যায়। রোমের বানিজ্যিক বিপর্যয় এবং অনুন্নত অর্থনৈতিক অবস্থা-ভূমিকে সম্পদের মূল উৎসে পরিণত করেছিল। ভূমি বিজয়ীর হস্তগত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে শাসন ক্ষমতাও তাঁর হাতে চলে যায়। এইভাবেই রাজনৈতিক ক্ষমতা প্রয়োগ, জমি ভোগদখল এবং জমিদার ও ভূমিদাসের ব্যক্তিগত সম্পর্ক মিলে মিশে একাকার হয়ে যায়। নেতাদের বর্দ্ধমান, রোমান আদর্শের প্রভাব, যুগের দ্বিধা-দ্বন্দ্ব অভিজাত গোষ্ঠীকে শক্তিশালী করে তোলে এবং গণপরিষদগুলি দুর্বল হয়ে পড়ে, কোন কোন স্থানে অবলুপ্ত হয়। জনগণ ক্ষমতাধর নেতার অনুগত হয়ে যায়। সর্বত্র বিশৃঙ্খলা, অরাজকতা মাথাচাড়া দিয়ে ওঠে, সভ্যতার বিকাশ এইভাবেই অবরুদ্ধ হয়ে যায়। **"Neither unity nor liberty was possible in feudalism and the political development ~~and the political development~~ of centuries seemed wasted."** (৫)

অর্থনীতি ছিল কৃষিভিত্তিক, গ্রাম্যসমাজ নিজস্ব কৃষিখামার সহ প্রায় স্বয়ং সম্পূর্ণ ছিল। ভূমি-সম্পদের প্রধান উৎস হওয়ায় রাজা থেকে যোদ্ধা প্রত্যেকেই সরাসরি কৃষি উৎপাদনের উপর নির্ভরশীল ছিলেন। জমি নিয়ন্ত্রণ গ্রাম্য সমিতির উপর ছিল। গ্রামের কর্তব্য ছিল ছোট খাটো আইনশৃঙ্খলার মীমাংসা করা। সমাজ ও সরকারের সংগঠন ছিল স্থানীয়।

এরই উপর ভিত্তি করে সামন্ততান্ত্রিক সংগঠন গড়ে ওঠে। ধারাবাহিক বিশৃঙ্খলা এবং যোগাযোগের আদিম উপকরণের উপস্থিতিতে জীবন-সম্পত্তি রক্ষার প্রাথমিক দায়িত্ব পালনে কেন্দ্রীয় সরকার ব্যর্থ হলেন, তখন সমাজ জীবনে শক্তিশালীর মূল্য বেড়ে যায়। নিজেদের রক্ষার তাগিদে ছোটজমির মালিক শক্তিশালীর সেবা করতে থাকেন, এমনকি তাঁরা ভূমিস্বত্ব ত্যাগ করে সেবা ও সামগ্রীর বিনিময়ে জমিদারের অধীনে বর্গাচাষ করতেন। জমিদারের সম্পদ ও সম্পত্তির শ্রীবৃদ্ধি এভাবেই স্ফীত হতে থাকে। ভূমিদাস সর্বতোভাবে মালিকের অধীন হয়ে যায়। সামন্ততন্ত্র এইভাবেই ভূমিস্বত্ব-কেন্দ্রিক মতবাদে পরিণত হয়। কায়েমী স্বার্থের এই ব্যবস্থা উঁচু থেকে নীচ-সমাজের সর্বস্তরে পরিব্যাপ্ত হয়ে সরকারের সকল বিভাগকে স্পর্শ করে। নতুন ভূমি ব্যবস্থায়-রাজাই একমাত্র ভূমির মালিক গণ্য হন। জমিদারদের তিনি জমির মালিকানা প্রদান করেন, বিনিময়ে তাঁরা রাজাকে সেবা করেন। ভূস্বামীদের অধীনে বর্গাদারেরা কাজ করেন এবং অবশেষে এই ব্যবস্থা ভূমিদাসদের মধ্যে ছড়িয়ে পড়ে, যাদের দৈহিক শ্রমের উপর সামন্ততান্ত্রিক কাঠামো দাঁড়িয়ে থাকে। নিজ নিজ এলাকায় জমিদারগণ প্রধান হয়ে ওঠেন। কালক্রমে সামন্তবাদ অনিবার্যভাবে সৈন্য, রাজস্ব এবং আদালত, রাজনৈতিক শক্তির—এই তিনটি উপকরণকে করায়ত্ত করেই গড়ে ওঠে। সম্পত্তির সম্পর্ক ছিল চুক্তির মত, যেখানে উভয় পক্ষের ব্যক্তিগত স্বার্থ রক্ষিত হত। নিজেদের সুবিধার জন্যে তাঁরা পরস্পরকে সাহায্য করতেন। যদিও সামগ্রিকভাবে রাজার ভূমি মালিকানা-তাঁরই শক্তি বৃদ্ধির সহায়ক হত। সামন্তদের পারস্পরিক নির্ভরশীলতা, স্বেচ্ছাশ্রম এবং অনুল্লিখিত চুক্তির চিহ্ন আধুনিক রাজনৈতিক সম্পর্কে দেখা যায় না। সামন্ততান্ত্রিক ভূমিস্বত্ব রাজাকে এবং আরও নির্দিষ্টভাবে কোন পরিবারকে বৈধ সামন্ততান্ত্রিক উপায়ে শক্তি বৃদ্ধিতে সাহায্য করেছিল। যেমন—escheat বা সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করণ ব্যবস্থা।

যদিও সামন্ততন্ত্র মূলতঃ ভূমিকেন্দ্রিক তবুও মিল পরিচালনা করা, কর আদায় করা অথবা সরকারী অফিস চালনা করা প্রভৃতি মূল্যমান-নির্ভর যে কোন কাজই সামন্তপ্রভুরা করতেন। আসলে সম্পূর্ণ প্রশাসনিক ব্যবস্থা প্রচলিত ভূমিস্বত্ব-কেন্দ্রিক হয়ে উঠল এবং জমির মত সরকারী অফিসও উত্তরাধিকারী সূত্রে প্রাপ্ত সম্পত্তিতে পরিণত হল।

আদালতও ছিল সামন্ততান্ত্রিক আদালত ঃ একে বলা যেতে পারে Council of Lords। এই আদালত সামন্ততান্ত্রিক সম্পর্ককে বাঁচিয়ে রাখার জন্যে সবরকম বিরোধের মীমাংসা করত। বিচিত্র সামন্ততান্ত্রিক সংগঠনে রাজা ছিলেন সমাজের অগ্রগণ্য। আদালত অথবা রাজা-আদালত যুগ্মভাবে শাসন-বিচার করতেন। সামন্তবাদের একটা দৃষ্টিভঙ্গী সরকারী কর্তৃত্বকে বেসরকারী সম্পর্কে নিমজ্জিত করতে চায়, অন্য দৃষ্টিভঙ্গী Common Wealth এর ধারাবাহিক ঐতিহ্যকে বাঁচিয়ে রাখতে চায়। যেখানে রাজাই হবেন প্রধান প্রশাসক। উভয় দৃষ্টিভঙ্গীর সমাবেশ ও সংমিশ্রণ সামন্ততান্ত্রিক আদালতকে পরবর্ত্তী মধ্যযুগীয় সাংবিধানিক নীতি ও প্রতিষ্ঠানের আধারে পরিণত করেছিল।

সামন্তবাদ একটি নির্দিষ্ট এলাকায় নিরঙ্কুশ শাসনের গতিরুদ্ধ করেছিল। কারণ এর প্রয়োজন ছিল সরকারের মধ্যেই সরকার, যাতে কেউ পূর্ণ সার্বভৌম ক্ষমতা ভোগ করতে না পারেন। বিকেন্দ্রীভূত সামন্ততন্ত্র প্রকৃত রাজনৈতিক প্রগতি বিরোধী ছিল। আইন ছিল প্রাথমিকভাবে সামাজিক প্রথা। আইন ও সার্বভৌমত্ব সম্পর্কে আধুনিক ধারণা তখন ছিল অজ্ঞাত। রাজা এবং প্রজা উভয়েই প্রথাগত আইন মানতে বাধ্য ছিলেন।

কালক্রমে ধনিক-বণিক-অভিজাত গোষ্ঠীর সঙ্গে ভূস্বামী সামন্তদের পার্থক্য স্পষ্ট হয়ে ওঠে। বণিক সম্প্রদায় সামন্ততন্ত্রের বিরোধিতা করেন। তাঁরা জমিদারদের নিয়ন্ত্রণ মুক্ত হতে চান এবং সফলও হন। সাময়িকভাবে তাঁরাই নগর রাষ্ট্রের আদর্শ ও প্রতিষ্ঠানকে উজ্জীবিত করেন। সামন্ততন্ত্রের বিশৃঙ্খলার মধ্যে থেকে একটা নির্দিষ্ট রাজনৈতিক রূপের আবির্ভাব হয়। ভাষা এবং জাতীয়তার বন্ধন, প্রাকৃতিক সীমানায় খন্ড খন্ড সামন্ত-গোষ্ঠীকে স্থায়ী সংগঠনের অঙ্গীভূত করে এবং ধীরে ধীরে এর মধ্যে থেকেই ফ্রান্স, স্পেন, ইংল্যান্ড, ইটালী ও জার্মানির মত দেশের জন্ম হয়।

ভারত

সামন্তপ্রথা মধ্যযুগে ইউরোপে অত্যন্ত প্রকট, কিন্তু ভারতে এই ব্যবস্থার সুস্পষ্ট চিত্র মধ্যযুগের পাওয়া না গেলেও সামন্ত প্রথার কয়েকটি নিজস্ব চরিত্র আনুমানিক ৩০০ খ্রীষ্টাব্দে দেখা যায়। এই সময় ভারতে সামন্তপ্রথার দুটি বৈশিষ্ট্য চোখে পড়ে—(ক) ভূমিস্বত্বের বৈশিষ্ট্য (খ) ভূম্যধিকারীদের রাজ্য শাসনের ক্ষমতা।

মৌর্য পরবর্তী যুগে 'ভূমি পট্টলী'র সন্ধান মেলে—যেখানে জমির সঙ্গে মালিক সেখানকার শাসনেরও অধিকার দেওয়া হয়। এভাবেই সামন্ত প্রভুর জন্ম। ব্যক্তিগত শাসনের পরিকাঠামো গড়ে ওঠে। গুপ্তযুগে ব্রহ্মদেয় ভূমি পট্টলী সামন্তপ্রথার লক্ষণ স্পষ্ট। এই যুগের দ্বিতীয় বৈশিষ্ট্য হল রাজা কর্তৃক প্রধান সামন্তকে এবং প্রধান সামন্ত আবার ভূমিবন্দোবস্ত দান (Sub-infeudation) করে, এভাবেই মধ্যস্বত্ব প্রথার জন্ম হয়। চৈনিক পরিব্রাজক ফা-হিয়েন, হিউয়েন সাঙ প্রমুখ এই প্রথার উল্লেখ করেছেন। সামন্ত ক্রমশঃ বংশানুক্রমিক, আনুগত্যের ভিত্তিতে, প্রয়োজনে রাজাকে সেনা, অর্থ ও অন্যান্য সাহায্য দানের উপর নির্ভর করে গড়ে ওঠে। সামন্তগণ ইচ্ছানুযায়ী কৃষকদের উচ্ছেদ, বেগার খাটানো ও নিয়োগ করতে পারতেন। এইভাবে মধ্যযুগের প্রারম্ভে প্রগতিহীন, উদ্যমহীন, উৎপাদন ও পরিশ্রমবিমুখ পরগাছা

শ্রেণীসামন্তদের উদ্ভব হয়। সমাজের বৃহত্তর শ্রেণী অদৃষ্টবাদী হয়ে যায়। "শুক্রনীতি সার" গ্রন্থে সামন্তের পরিভাষা হিসেবে বলা হয়েছে, "১০০টি গ্রামের শাসককে সামন্ত বলা হত এবং এই সম্পূর্ণ ক্ষেত্রে থেকে বার্ষিক ১৩০০০০০ কর্ষ রাজস্ব আদায় হত।" (৬) মৌর্যপরবর্তী যুগে সামন্ত শব্দটির বহু প্রতিশব্দ পাওয়া যায়। যেমন—"ভূপাল, ভোক্তা, ভোগী, ভোগিক, ভোগিজন, ভোগপতিক, ভোগিরূপ, মহাভোগী, বৃহদ্ভোগী, বৃহদ্ভোগিক, রাজা, রাজ্ঞ, রাজরাজনক, রাজন্যক, রানক, রাজপুত্র, রাজবল্লভ, ঠাক্কুর, সামন্ত, মহাসামন্ত, মহাসামন্তাধিপতি, মহাসামন্তরানক, সামন্তকরাজা, মাণ্ডুলিক ইত্যাদি।" (৭) "সামন্তগণ সম্রাটের সেবা, সম্মানজনক ব্যবহার, অবনতমস্তকে দণ্ডায়মান থাকা ইত্যাদি কর্তব্য হিসেবে মানতে হত।" (৮) "সামন্তগন সম্রাটদের সৈন্য দিয়ে সাহায্য করতেন। হর্ষ নিজে সামন্তদের সৈন্যবাহিনী দ্বারা সুসজ্জিত ছিলেন।" (৯) "এদের নগদ মুদ্রার পরিবর্তে ভূমি বৃত্তিদানের ব্যবস্থার কথা উল্লেখ আছে মনুস্মৃতি গ্রন্থে।" (১০) "হিউয়েন সাঙ্ লিখেছেন, প্রকাশক, মন্ত্রী, বিচারক এবং পদাধিকারীদের প্রত্যেকের ভরণ-পোষণের জন্য জমি নির্দিষ্ট করে দেওয়া হত।" (১১)

সুলতানীযুগে সামন্তপ্রথা ইচ্ছায় পর্যবসিত হয়। তুর্কীরাই এর দায়িত্ব বেশী লাভ করে। মুঘলযুগে জমিদারীর কয়েকটি স্তর বিন্যাস পরিলক্ষিত হয়—"(ক) বিভিন্ন শর্তের ভিত্তিতে জমি লাভ করে জমিদার আখ্যায় ভূষিত হতেন। (খ) নির্দিষ্ট কর প্রদানের প্রতিশ্রুতিতে বংশানুক্রমিক জমিদারী লাভ করতেন। (গ) যে ব্যক্তি বেতনের পরিবর্তে জমিদারী লাভ করতেন, তাঁকেও জমিদার বলা হত। (ঘ) সরকারের আদেশে কোন নির্দিষ্ট অঞ্চলে মালিকানা লাভ করলেও তিনি জমিদার বলে গণ্য হতেন। (ঙ) যে এলাকায় যাঁর নির্দিষ্ট কিছু অধিকার ও স্বত্ব স্বীকৃত ছিল তাকেও জমিদার বলা হত।" (১২)

প্রাথমিক স্তরে জমিদার কৃষকদের কাছ থেকে রাজস্ব আদায়, নিজ এলাকায় শান্তি রক্ষা ও নিজ জমিতে চাষ করা ইত্যাদি প্রধান দায়িত্ব হিসেবে পালন করতেন। নিজ এলাকায় সামন্ত বা জমিদারগণ যথেচ্ছাচারী ছিলেন। ইচ্ছামত করস্থাপন, আদায় ও অত্যাচার করতেন; ফলে কৃষকদের জীবন হয়ে উঠত দুর্বিষহ। জমিদারের পরেই থাকতেন স্বত্বভোগী বা কর্মহীন শ্রেণী—যাঁরা কৃষকদের কাছ থেকে শস্যের এক অংশ আদায়-সম্মানী হিসেবে প্রায় বলপূর্বক আদায় করতেন।

কৃষকদের জমিতে চাষ করার অধিকার বংশানুক্রমিক হলেও জমি বিক্রি বা বন্ধকী রাখার অধিকার ছিল না। ফলে ফসল কম হলে সকলের সন্তুষ্টির জন্যে বা করপ্রদানের জন্যে কৃষকরা তাদের গৃহ পালিত পশু, স্ত্রী, সন্তান-সন্ততি বিক্রি করতে বাধ্য হত। সহ্যের সীমা অতিক্রম করলে মাঝে মাঝে তারা বিদ্রোহ করত। "কোন কোন সময় দলবদ্ধভাবে ডাকাতি ও রাহাজানি করত।" (১৩) "সব মিলিয়ে পূর্ব-মধ্যকালে ভূস্বামীত্বের প্রথার নিয়মগুলি শক্তিশালী বিকেন্দ্রীকৃত সামন্ততান্ত্রিক ব্যবস্থার পরিচয় বহন করে। মুদ্রাভিত্তিক অর্থব্যবস্থার পুনঃ প্রতিষ্ঠা এবং কেন্দ্রীয় নিয়ন্ত্রণের বিকাশের পরিণাম স্বরূপ মোগল আমলে এই ব্যবস্থা দুর্বল হয়ে পড়েছিল।" (১৪)

এরপর এল বৃটিশ সরকার। প্রারম্ভিক যুগে কোম্পানী দ্বৈতশাসন জারি করে। যার অনিবার্য ফলশ্রুতি হল ১১৭৬-এর বাংলাদেশে ভয়াবহ মন্বন্তর। ওয়ারেন হেস্টিংস এই শাসনের অবসান ঘটিয়ে ভ্রাম্যমান কমিটি গঠন করেন। পাঁচ বছরের জন্যে জমিদারী বন্দোবস্ত করে রাজস্ব আদায়ের দায়িত্ব জমিদারের সঙ্গে কমিটিকে দেন। কিন্তু এই ব্যবস্থায় রাজস্ব যথাযথ আদায় না হওয়ায় এবং জমিদার কর্তৃক প্রজাদের উচ্চহারে রাজস্ব আদায় করার অজুহাত বন্ধ করতে লর্ড কর্নওয়ালিশ ইংল্যান্ডের অনুকরণে সতেরশ তিরানব্বই খ্রীষ্টাব্দের ২২শে মার্চ "দশশালা বন্দোবস্ত" চালু করেন। এই ঘোষণার দ্বারা বাৎসরিক নির্দিষ্ট খাজনার বিনিময়ে জমির মালিকানা স্বীকার করা হয় এবং জমি বিক্রির অধিকার দেওয়া হয়। জমি তখন স্থাবর সম্পত্তি থাকলেও তা বন্ধক, নীলাম, বিক্রি সবই হতে শুরু করে। এ প্রসঙ্গে A. R. Desai বলেছেন **"The new revenue system introduced by the British in India Superseded the traditional right of the village community over the village land and created two forms of property in Land, Land lordism in some parts of the country and the individual peasant proprictorship in others, ... Thus private property in Land came into being in India, land became private property, a commodity in the market which could be mortgaged, purchased or sold."** (১৫)

এরপর জমি লাভ-জনক ব্যবসায়ে পরিণত হয়। কৃষকরা অনাবৃষ্টি, অতিবৃষ্টি প্রভৃতি প্রাকৃতিক দৈবদুর্বিপাকে এবং আকাশ পরিমাণ করের বোঝায় পিষ্ট হয়ে পরিবার পরিজনদের মুখের গ্রাস জোগাতে জমিটুকু বিক্রি করতে বাধ্য হয়। তারা ভূসম্পত্তি হারিয়ে ক্ষেতমজুরে পরিণত হয়। তাদের স্ত্রী-পুত্র-কন্যা সম্ভ্রান্ত অর্থশালী বাবুদের বাড়ীতে ক্রীতদাস-দাসীতে পরিণত হয়। এই অব্যবস্থা উনিশ শতকের অন্তিম লগ্ন পর্যন্ত চলেছিল। গ্রামে তখন জমিদার, ব্রাহ্মণ সমাজপতি এবং জমি এই ছিল প্রধান। গ্রামীন জীবন কিছুটা স্বয়ং সম্পূর্ণ ছিল এবং তাও জমিদারদের নিজস্ব প্রয়োজনে। সরকারী তহবিলে প্রদত্ত নির্দিষ্ট খাজনা দিয়ে প্রজাদের কাছে ইচ্ছামত খাজনা ধার্য করেছে। সেই আদায়ীকৃত কৃষকদের রক্ত নিঙড়ানো অর্থ নিয়ে জমিদারগণ বাঈজী, ব্যাভিচারী, বেহিসেবী জীবনযাপন করেছেন। কৃষককুল মেরুদন্ডহীন হয়ে খাদ্যাভাবে শীর্ণজীর্ণ হয়ে

মৃত্যুর কাল গুনেছে। ফলে সৃজনশীলতার অভাবে জমিদারদের মধ্যাহ্ন সূর্য পশ্চিম দিগন্তে ঢলে পড়ে। আবির্ভূত হল শহরের ধনী ব্যবসায়ীর। যাঁরা কাঁচা পয়সার মালিক হয়ে বৃটিশদের কৌশলে গ্রামে জমিদারী কিনে জাঁকিয়ে বসতে উদ্যত। যাঁরা ঐতিহ্যহীন, আভিজাত্য হীন অথচ সম্মানের ভিখারী। তাঁরা অর্থ দিয়ে সমাজে প্রতিষ্ঠা পেতে চান। এঁদেরই এই ভিত্তিহীন আভিজাত্যের সঙ্গে ক্ষয়িষ্ণু জমিদারদের শুরু হল প্রকাশ্য দ্বন্দ্ব। শুরু হল সামন্ততন্ত্রের প্রতিভূদের সাথে ধনতন্ত্রের শেষ লড়াই। এই দ্বন্দ্ব লাভপুরেও ঘটেছে তারাশঙ্করের চোখের সামনে। "এঁদের সঙ্গে আরম্ভ হল লক্ষ লক্ষ টাকার মালিক এই ভাগ্যবান ব্যবসায়ীর বিরোধ।" (১৬) এই বিরোধ তারাশঙ্করের গল্পে ও উপন্যাসে বার বার দেখা দিয়েছে।

বিলীয়মান সামন্তগণ অস্তিত্ব রক্ষার জন্যে দেবতাদের স্মরণাপন্ন হলেন। ধর্মজীবনের দুটিই পথ। তেত্রিশ কোটি দেবতার প্রায় প্রত্যেকেই হাজির হলেন কখনও সন্ন্যাসীর মাধ্যমে, কখনও বা বেদে, বাউল, পটুয়া, সাপুড়ে, গোরুমারা ইত্যাদির বেশে। তারাশঙ্কর সামন্ততন্ত্রের একজন অংশীদার। তাই তিনিও এইসব ঘটনার সাক্ষী ছিলেন। তাঁর জীবনেও এমনি এক সন্ন্যাসীর ভূমিকা ছিল গুরুত্বপূর্ণ। "এই সন্ন্যাসীটি আমার মমতায় এমনই আচ্ছন্ন হন যে, সমস্ত জীবনে তিনি আর লাভপুর ত্যাগ করেন নি। তাঁর পার্থিব দেহের সমাধি আমি নিজে রচনা করেছি। সন্ন্যাসী প্রথম জীবনে পল্টনে চাকরী করতেন, তখন তাঁর নাম ছিল বলভদ্র পান্ডে। সন্ন্যাসী জীবনে তাঁর নাম হয়েছিল রামজী সাধু।" (১৭) এই সন্ন্যাসী প্রভাবিত অনেক কটি (৭টি) গল্প রয়েছে।

দ্বিধাহীন চিত্তে ঋজুবাক তারাশঙ্কর তাঁর গল্পও উপন্যাসে দেখিয়েছেন, গ্রামীণ সমাজ কীভাবে ধ্বসে পড়ছে, যন্ত্রনির্ভর উৎপাদন ব্যবস্থা, আধুনিক শিল্প প্রতিষ্ঠান কীভাবে গ্রামীণ সংস্কার ও শাসনের সমস্ত বন্ধনকে শিথিল করছে। শহুরে জাঁকজমক ও স্বাচ্ছন্দ্যে প্রলুব্ধ হয়ে অসহায় বেকার গ্রাম ছেড়ে ভিড় করছে শহরের রাস্তায়। গ্রামীন ধর্মীয় বিশ্বাসের গাঢ়ত্ব ক্রমশঃ ম্লান হয়ে আসছে—নির্মোহ দৃষ্টিতে তারাশঙ্কর তা দেখিয়েছেন, তিনি আরও দেখেছেন যুগধর্মের আঘাতে সামন্তগণ ধীরে ধীরে লীন হয়ে যাচ্ছে। এর জন্যে তিনি দীর্ঘশ্বাস ফেলেছেন তথাপি তিনি নবীনকেই, নব-পরিবর্তনকেই বরণ করেছেন আনন্দের সঙ্গে। লেখকের এই দীর্ঘশ্বাস ও উল্লাস উভয়েই সত্য। এটি সাহিত্যেরও সত্য।

তারাশঙ্কর ছিলেন তান্ত্রিক বংশের সন্তান এবং নব্য ব্যবসায়ীগণ বৈষ্ণব। "ঐ একই গ্রামীণ পরিমন্ডলে সমস্ত তান্ত্রিকতার সঙ্গে ধনতন্ত্রের সংঘাত রূপকে যেমন প্রত্যক্ষ করেছিলেন তারাশঙ্কর; তেমনি এখানেই দেখেছিলেন তান্ত্রিক বীরাচারী বংশ পরম্পরার সঙ্গে সদ্য উদীয়মান বৈষ্ণব কুলের প্রতিযোগিতার বাস্তব চিত্র"। (১৮) এই অসম প্রতিযোগিতায় সামন্ততন্ত্রের পতন অবশ্যম্ভাবী জেনেও তারাশঙ্কর তাঁদের অবক্ষয়ের দিকগুলি তুলে ধরেছেন। অতীতকে সরিয়ে নব্য যন্ত্র বা ব্যবসায়ীর উত্থানকে তিনি মেনে নিয়েছেন ঠিকই; তাই বলে অতীত ঐতিহ্যকে তিনি অবিচার বা শ্রদ্ধা দেখাতে বিস্মৃত হন নি। তাঁর বিখ্যাত "আরোগ্য নিকেতন" উপন্যাসের নায়ক জীবন মশাই তাঁর কম্পাউন্ডার শশীকে এক জায়গায় বলেছেন, "সে আমলটা বড়ই সুখেই গিয়েছে, কী বলিস শশী? ওঃ তার আর কথা আছে গো! সে একেবারে সত্যযুগ।" এই হচ্ছে তারাশঙ্করের মনের কথা। এই ঐতিহ্য প্রীতিই হয়তো কোন কোন ক্ষেত্রে নতুনকে বরণ করতে তারাশঙ্করের লেখনীকে আড়ষ্ট বলে মনে হতে পারে; কিন্তু এমন একটা সময় ছিল যে দিন সমাজের সমস্ত দায়িত্বে ছিলেন জমিদারগণ। তাঁরা যেমন মন্দ কাজ করেছেন আবার ভাল কাজও করেছেন—রাস্তাঘাট, মন্দির, মসজিদ, দীঘি, পুষ্করিণী, স্কুল কলেজ এক কথায় বলা যায় যে গ্রামবাংলার সম্পূর্ণ সংস্কৃতিটাই গড়ে উঠেছিল তাঁদেরই সাহায্যে অথচ সেই সামন্তপ্রভুদের দুর্দিনে তাঁদের প্রতি সহানুভূতি না দেখানো কোন প্রগতিশীল মানুষের পক্ষেই সম্ভব নয়, তারাশঙ্করের ক্ষেত্রেও তাই হয়েছিল। "যা অনিবার্য তাকে মেনে নেওয়া ছাড়া গতি নেই, আমিও পরিবর্তন চাই। নতুন সমাজ গড়ে তুলতে হলে পুরানোকে বিদায় দিতেই হবে একথাও মানি। কিন্তু যা যায় তার জন্য দীর্ঘশ্বাস ফেলব না, হাহাকার করব না—তাই বা কেমন করে হয়?" (১৯) "মা" গল্পে তারাশঙ্কর যেন কার্ত্তিকবাবু। রামসুন্দরকে কার্ত্তিকবাবু বলেছেন, "বড় দুঃখ হয় বুঝলে রামসুন্দর; এতবড় বংশের এই রকম পরিণাম দেখলে বড় দুঃখ হয়। বিশেষ করে আমাদের দুঃখ হয় বেশী।" এইভাবে বহু ক্ষেত্রেই তিনি সামন্তদের অবক্ষয়ে হাহুতাশ করেছেন।

বিলীয়মান সামন্ত-জমিদার অর্থনৈতিক সমস্যা সম্মুখীন হয়েছেন যদিও স্বভাবসিদ্ধ দাপট, জৌলুস, দেমাক, ও আভিজাত্য জাহির করতে ছাড়েন নি, বিশেষ করে নায়েব, গোমস্তা ও নিরীহ প্রজাদের কাছে। বংশপরম্পরায় জমিদারী খন্ড খন্ড হয়ে বহু জমিদার সৃষ্টি হয়। তাঁদের খরচ অনেক বেড়ে যায় কিন্তু আয় যায় কমে। তাই সরকারী খাজনা দেবার সময় হলে অনেক জমিদারের নাভিশ্বাস ওঠে, চোখে সরষে ফুল দেখেন। তারাশঙ্করের জীবনেও তা ঘটেছিল। তার প্রমাণ তিনি নিজেই দিয়েছেন তাঁর "রাজা, রানী ও প্রজা" গল্পে। গল্পের প্রথমেই রাজা (লেখক) সরকারী খাজনা দেবার সময় তীব্র অর্থাভাবের সম্মুখীন হয়েছেন। তিনি জমিদারী ও জমিদারীর প্রতিষ্ঠাতা পিতৃপুরুষদের প্রতি কটাক্ষ করে বলেছেন, " পৈতৃক ক্ষুদ্র জমিদারী কঠিন পেষণে গলায় চাপিয়া বসিয়াছে। জমিদারী এখন দাঁড়াইয়াছে হয়রানি। সরকারের সদনে এক একবার রাজস্ব দাখিলের সময় হয় আর নিখিল ভূবন অন্ধকার হইয়া ওঠে।" (রাজা, রানী ও প্রজা)। এই পর্যায়ে আর একটি গল্প "সমুদ্র মন্থন"। ক্ষয়িষ্ণু জমিদার উমানাথ বাবুর দীর্ঘশ্বাস প্রতিধ্বনিত হয়েছে। একদা, যেখানে জৌলুস ও আড়ম্বরে চারদিক ঝলসে উঠত, আজ আর কিছুই নেই। তবুও আভিজাত্যকে আঁকড়ে ধরে নিজের

অবক্ষয়কে সতরঞ্চি দিয়ে ঢেকে রাখতে চেয়েছেন। দুর্ভিক্ষ প্রপীড়িত বাংলার সামাজিক জীবন মৃত্যুর মুখোমুখি দাঁড়িয়েছে। সরকারী খাজনা দেবার সময় আগত। তাই 'নীরব উৎকণ্ঠায় উমানাথবাবু পাগল হইয়া যাইবেন বোধ হয়।" (সমুদ্র মন্থন)। গল্প দুটিতে জমিদারীতন্ত্রের প্রতি বিরাগ অভিব্যঞ্জিত হয়েছে।

আবার "খড়্গ" গল্পটির বক্তা রাজাবাবু। প্রাচীন ঐতিহ্যবাহী রামজীবন রায় বিশাল জমিদার বংশের সন্তান, বর্তমানে বিলীয়মান গোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত। তিনি উকালতি করে জীবিকা নির্বাহ করেন। কিন্তু অতীত ঐতিহ্য এবং সামন্তদের প্রতি তাঁর অসীম শ্রদ্ধা প্রকাশ পেয়েছে।

মধ্যযুগ থেকে গত দুই-তিন শতক ধরে এই প্রদেশে জমিদারগণই ছিলেন সর্বস্তরের মানুষের প্রাণশক্তির আধার ও কেন্দ্রস্থল। সমাজে যেটুকু সংস্কৃতি ও প্রগতিচর্চা হত তার মূলে ছিলেন এঁরাই। আবার সামন্তগণ অত্যাচারী, দাম্ভিক, মদগর্বী, শঠ, প্রবঞ্চক, চরিত্রহীন প্রভৃতি তমগুণেরও অধিকারী ছিলেন। ফলে সমাজে দুঃখ, যন্ত্রণা, দারিদ্র্য সৃষ্টি হয়েছিল সংগত কারণেই।

সামন্ততন্ত্রের পটভূমিকায় তারাশঙ্কর রচনা করেছেন বেশ কয়েকটি সার্থক গল্প ও উপন্যাস। 'ধাত্রীদেবতা'য় (১৯৩৯), কালিন্দী (১৯৪০) তে এবং উত্তরকালে "পদচিহ্ন" (১৯৫০)-তে অর্থনীতি, যন্ত্রসভ্যতা ইত্যাদি বিচিত্র শক্তির চাপে সামন্ত জীবনের ক্ষয় ও ক্রম বিলোপের ছবি আছে। 'ধাত্রীদেবতা'য় নায়ক শিবনাথ নিজেই জমিদারী শেষ পর্যন্ত গোঁসাইবাবার হাতে সমর্পণ করেছেন। অন্যদিকে 'কালিন্দী'তে দেখা যায় কলওয়ালা মিঃ মুখার্জী যান্ত্রিক করালগ্রাসের সম্মুখীন হয়ে সামন্ত্রতন্ত্রের প্রতিনিধি ইন্দ্র রায় শেষ পর্যন্ত পরাভব স্বীকার করতে বাধ্য হয়েছেন। রামেশ্বরের কনিষ্ট পুত্র অহীন্দ্রের মনে সমাজতান্ত্রিক চেতনার আদর্শও সামন্ততন্ত্রের ক্ষয়িষ্ণু শক্তির উপরে আঘাত হেনেছে।

আবার অনেক ছোটগল্পের মধ্যেও তারাশঙ্কর সামন্ততন্ত্রের অবক্ষয় তুলে ধরেছেন। যেমন, জলসাঘর, রায়বাড়ি, সাড়ে সাত গন্ডার জমিদার, বন্দিনী কমলা, অগ্রদানী, নুটুমোক্তারের সওয়াল, মা, জন্মান্তর, বিষধর, প্রতিমা, শেষকথা, আরোগ্য, মুখুজ্জে মহাশয়, প্রভৃতি গল্পে সামন্ততন্ত্রের অবক্ষয়ের দিকটি সুস্পষ্ট। জমিদারদের দোর্দন্ড প্রতাপ, আভিজাত্য, ঐশ্বর্যের গরিমা লেখকের হৃদয়কে আলোড়িত করেছে। তাঁর চোখে ব্যক্তিত্ব, ক্রোধ, জিদ, মহানুভবতা, শিক্ষা ও সংস্কৃতি প্রভৃতি মিলিয়ে বাংলাদেশের জমিদারগণ যেন এক বিরাট মহীরুহ। "মনোজ বসু"র প্রথমদিকের গল্পগুলিতে প্রগতিবাদী জমিদারদের চিত্র তুলে ধরা হয়েছে।

সামন্ততন্ত্রের ভাঙনের এক সার্থক চিত্র পাওয়া যায় তারাশঙ্করের "জলসাঘর" গল্পে। প্রচলিত ধ্যান-ধারণার বশবর্তী হয়েও লেখক অতীতের অবসানের বেদনা-বিহ্বলতা, অবসাদময় বিষন্নতা উপলব্ধি করেছিলেন। "তিরিশের দশকে এ দেশের রাজনীতি, সমাজ, অর্থনীতি এবং ধর্মের চেতনার মধ্যে একটা ব্যাপক এবং অস্পষ্টভাবেই পুরোনো কালের জৌলুষ মুছে দেওয়া যে পরিবর্তন বোধ দেখা দিয়েছিল, তারাশঙ্করের "জলসাঘর" এ তারই সুস্পষ্ট ইশারা।" [২০] জলসাঘরে সে সংকট দেখা দিয়েছিল তার সূত্রপাতের পূর্বাভাস রয়েছে "রায়বাড়ি" গল্পে। "রায়বাড়ি"-র জমিদার রাবণেশ্বর রায়ের দীপ্তশৌর্য, ভোগলিপ্সা, প্রবল প্রতিহিংসাপরায়ণতা শেষের দিকে চরমে উন্নীত হয়। ঐশ্বর্যের প্রাচুর্যে রায়বাড়ির জলসাঘরের মজলিস ভেসে যায়। সারা বাঙলায় রাবণেশ্বরের সম্পত্তি ছড়ানো রয়েছে। শাক্ততান্ত্রিক রাবণেশ্বর রায় সর্বদা রুদ্রাক্ষের মালা বিরাট বক্ষে ধারণ করতেন। "তারা মা" বলে শক্তির সাধনা, আবার দায়িত্বশীল পিতার মত প্রজাদের সেবা দুই-ই করেছেন। হুদ্দা-শ্যামপুরের থেকে আগত চল্লিশজন প্রজাকে রাত্রে আশ্রয়ও দিয়েছেন। নিজে দাঁড়িয়ে থেকে মাছ ভাত খাইয়েছেন, এমনকি বাড়ীর জন্যে বরাদ্দ দুধ প্রজাদের খাইয়েছেন। প্রজারা রাবণেশ্বরকে বলেছে, "রাজায়-প্রজায় সম্বন্ধ হল বাপ আর বেটা।" বিদ্রোহী প্রজাদের কৌশলে রায়বাবু শিক্ষা দিয়েছেন, "কিন্তু বেটায় এত বাপ বদল করে কেন হে।" পরদিন প্রাতে প্রজাদের বিদায়ের পূর্বে প্রত্যেকে ধুতি, চাদর এবং গাড়িভাড়া দিলেন। প্রজাদের মধ্যে গুপ্ত চিকিৎসক ছিলেন তাই তাঁকে রায়বাবু সম্মানীস্বরূপ পাঁচ বিঘা নিষ্কর ভূমি দান করেন।

কিছুদিন পর যখন গোমস্তাকে হুদ্দা-শ্যামপুরের প্রজারা ফুটন্ত গুড়ের কড়াইয়ে পুড়িয়ে মারে তখন রাবণেশ্বর দশাননমূর্তি নিয়ে বিদ্রোহী প্রজাশাসনে উদ্যত হয়েছেন। লাঠিয়াল কালী বাগদীকে হুকুম দেন, "ছত্রিশ মৌজা কালো করে দিয়ে আসতে হবে।" প্রিয়তমা পত্নীর নিষেধ তিনি কর্ণপাত করেন নি। রাজোচিতভাবেই প্রজাশাসন করলেন। মাসখানেক পর যেদিন সন্ধ্যায় জলসাঘরে নাচ গান চলছে, বাপের বাড়ী থেকে স্ত্রীপুত্র আসছে তখন হঠাৎ কালী এসে সংবাদ দেয় রাণীমা বীজনগর থেকে ফেরার পথে—"আকস্মিক এক ঝড়ের তাড়নায় ময়ূরাক্ষী ও গঙ্গার সঙ্গমস্থলে ঘূর্ণিতে পড়িয়া বজরা-ডুবি হইয়াছে।" রাবণেশ্বর এই দুঃসংবাদ শুনে বলে উঠলেন, "তারা, তারা।" রাবণেশ্বরের বিরাট মানসিক পরিবর্তন ঘটে গেল। প্রজাদের সমস্ত সম্পদ অকাতরে দান করে সর্বত্যাগী হবার সংকল্প নেন। হঠাৎ গঙ্গার জল বাড়ে, দীঘলমারীর বাঁধ যায় ভেঙে। গ্রামের প্রজাদের আশ্রয়ের জন্যে রায়বাড়ির দরজা খুলে দেন রাবণেশ্বর। বৃদ্ধ নবীন গাঙ্গুলীর কন্যার বিয়ের জন্যে জলসাঘর খুলে দেন। ঘর থেকে বেরিয়ে যান কালীকে নিয়ে। নদীর ঘাট থেকে জলসাঘরের আলো আর সানাইয়ের শব্দ শুনে আবার ফিরে আসেন রাবণেশ্বর। নির্বংশ হবার জন্যে সপ্তম পুরুষ পর্যন্ত অপেক্ষা

করতে হয়। কারণ তখনও যন্ত্রসভ্যতা ও ধনতান্ত্রিক নগর সভ্যতা সম্পূর্ণরূপে মাথা চাড়া দেয়নি। রাবণেশ্বর এক বিরাট বিরল চরিত্র। "রায়বাড়ি গল্পে রাবণেশ্বর রায়ের দৃপ্তশীর্ষ, ভোগলিপ্সার মধ্যে অটল ভগবৎ ভক্তি, শোকে অবিচলিত ধৈর্য, দানে মুক্ত হস্ততা, ও বৈর-নির্যাতনে অনমনীয় দৃঢ় সংকল্প, এই সমস্ত দোষগুণ মিলিয়া তাঁর চরিত্রকে রাজোচিত বিশালতা দিয়াছে।" (২১) 'রায়বাড়ি' গল্পের জমিদার তারাশঙ্করের কল্পিত চরিত্র নয়। তিনি জমিদার বংশের সন্তান। হয়তো তিনি এমন চরিত্রের কথা শুনেছিলেন। তারাশঙ্কর নিজেই বলেছেন, "এমন চরিত্রের কথা শুনেছিলাম। ছেলেবেলা থেকে শুনছি এবং কঠিন চরিত্রের মানুষের ছায়া আমার পিতৃ পুরুষের মধ্যে, পিতৃ পুরুষদের সম সাময়িকদের মধ্যে দেখেছি বলেই এই চরিত্র এত সজীব, এত বাস্তব আমার কাছে। ১০৯২ লাটটি আমাদেরই ছিল। এই লাট শাসন করতে না পেরে আমাদেরই পূর্ব পুরুষ সেকালে নামকরা দুর্ধর্ষ জমিদারকে পত্তনি দিয়েছিলেন।" (২২) তিনি হলেন মুর্শিদাবাদ জেলার নিমতার অধিবাসী গৌরসুন্দর চৌধুরী। তিনি রাজারামপুরের জমিদার রাবণেশ্বর রায় হয়ে আবির্ভূত হয়েছেন তারাশঙ্করের লেখনীতে। রাবণেশ্বর যে প্রবল ক্ষমতা সম্পন্ন ও অত্যাচারী ছিলেন তা রাবনেশ্বরের কথাতেই প্রমাণ মেলে। রায়গিন্নী প্রজাপীড়নে বাধা দিতে উদ্যত হলে রায়বাবু বলেন, 'গিন্নী। মাটি বাপের নয়, মাটি দাপের। শ্যামপুরের প্রজারা আমার মাথায় পা দিয়েছে।" রাণীও পুত্রে মৃত্যুর পর মর্মাহত রায়বাবু নায়েবকে বিশাল শ্রাদ্ধের ফর্দ করতে বলেন। "রায়বাড়িতে এত বড় শ্রাদ্ধ যেন আর কেউ না করে থাকে।" এ প্রসঙ্গে স্মরণীয় যে তারাশঙ্কর তাঁর আত্মজীবনীতে লিখেছেন যে তাঁর এক শিক্ষক-বন্ধু শরৎচন্দ্র চন্দ এক বিরাট শ্রাদ্ধের ফর্দ দেখান এবং এই ফর্দই হ'ল রায়বাড়ি সৃষ্টির প্রেরণা। 'রায়বাড়ি' গল্পে সম্পদের আভিজাত্যে বেগবান সামন্ততন্ত্রের প্রতিভূ; অত্যাচারের বিরুদ্ধে বিদ্রোহী প্রজা, রায়গিন্নীর মমতা এবং যমদূতাকৃতি একনিষ্ঠ লেটেল কালী বাগদী-সকলেই সামন্ততন্ত্রের জালে বন্দী। বস্তুতঃ "তাঁর (তারাশঙ্কর) রচনায় জমিদার সম্প্রদায়ের সমৃদ্ধি ও ঐশ্বর্যের যুগ যেমন মধ্যাহ্ন দীপ্তিতে উদ্ভাসিত হয়েছে, তেমনি তার বিলীয়মান শেষ রশ্মির অপরাহ্নিক ম্লানিমা দীর্ঘ নিঃশ্বাসে ভরে উঠেছে।" (২৩)

"জলসাঘর" গল্পেও তারাশঙ্করের প্রাচীন জমিদার-তন্ত্র সম্পর্কে এক ধরণের মোহ ও আকর্ষণের চেহারাটি স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। তারাশঙ্করের কাছে 'রায়বাড়ি' প্রিয় গল্প, কিন্তু অনেকের কাছে তা নয়। "উৎকর্ষের বিচারে এবং বক্তব্যের পূর্ণতায় "জলসাঘর" এর সঙ্গে "রায়বাড়ি"র কোন তুলনাই চলে না।" (২৪) আসলে জলসাঘরে যে সংকটের সূত্রপাত –তার–পূর্বাভাস রয়েছে 'রায়বাড়ি' গল্পে। 'জলসাঘর'-এর বিশ্বম্ভর রায় বংশের সপ্তম পুরুষ, ক্ষয়িষ্ণু সামন্তের অন্তিম শিখা। 'চতুর্থ পুরুষ করিয়াছিলেন রাজত্ব, পঞ্চম ও ষষ্ঠ পুরুষ করিলেন ভোগ ও ঋণ। সপ্তম পুরুষ বিশ্বম্ভরের আমলেই রায়বাড়ির লক্ষ্মী সে ঋণ সমুদ্রে তলাইয়া গেলেন। বিশ্বম্ভর লক্ষ্মীহীন দেবরাজের মত শুধু বসিয়া বসিয়া দেখিলেন। শুধু এই মাত্র নয়, রায়বংশ এই সপ্তম পুরুষে নির্বংশ হইয়া গেল" (জলসাঘর)। প্রিভি কাউন্সিলের রায়ে বিশ্বম্ভরের সমুদয় সম্পত্তি চলে গেছে। সামান্য দেবোত্তর সম্পত্তির উপরেই এখন নির্ভরশীল। কলেরায় স্ত্রী-সন্তান মারা গেছে। তবুও আভিজাত্য বোধে ও আত্মমর্যাদা দানে তিনি হিমালয়ের মত অটল। নব্য ব্যবসায়ী মহিম গাঙ্গুলীর সঙ্গে দ্বন্দ্বে ক্ষত-বিক্ষত। বণিককুলের আবির্ভাব ও তাদের সঙ্গে বিলীয়মান সামন্ততন্ত্রের সংঘাত অনিবার্য, কারণ অস্তিত্ব ও অতীত দাপট রক্ষার তাগিদে সামন্তগণ তখন মরিয়া। খোদ লাভপুরেই এই দ্বন্দ্ব তারাশঙ্কর প্রত্যক্ষ করেছেন। জমিদার-প্রধান লাভপুরে হঠাৎ কয়লা খনির মালিক হয়ে আসেন এক পরিবার। শুরু হয় মর্যাদার লড়াই; গ্রামবাসীর কাছে শ্রেষ্ঠত্বের লড়াই। "১৮৯৮ সালে লাভপুরের সমাজ তখন দুই বিরোধী শক্তির দ্বন্দ্ব চলেছে.....বীরভূমের জমিদারদের একটা বৈশিষ্ট্য হল জমিদারীর আয়তন ও আয়ের ক্ষুদ্রতা এবং তাদের সংখ্যার বাহুল্য। ..... তাঁদের পরাক্রম কম নয়। তাঁরা বলতেন "মাটি বাপের নয়, দাপের, দাপ তো আয়ে নাই, দাপ আছে বুকে।' বুকে চাপড় মেরে তাঁরা বীর্যের দাবী ঘোষণা করে বলতেন,— "আমি জমিদার"। (২৫) এই গল্পে জমিদারের সঙ্গে নব্যব্যবসায়ীর দ্বন্দ্বের মধ্যে সেই ঐতিহাসিক সংঘাতেরই ইঙ্গিতমাত্র। শ্রীভ্রষ্ট বিশ্বম্ভর গৃহকোণে আত্মগোপন করে থাকেন। মহিমের মোটর গাড়ির হর্ণ কানে আসে, তখনই তাঁর তুফানের (ঘোড়া) হ্রেষারব, এবং ছোটগিন্নী (হস্তিনী)র গর্জন অতীতকে স্মরণ করায়। মহিমের উদ্ধত ব্যবহার বিশ্বম্ভরকে শেষবারের মত গৃহের বাইরে এনেছে। দীর্ঘকাল বাদে আবার জলসাঘর খুলেছেন। মদের নেশায় আর আভিজাত্যের দয়ায় বাঈজীর মনোরঞ্জনে লক্ষ্মীর ঝাঁপির শেষ সম্বল নিঃশেষ হয়ে যায়। এমনকি মৃতা স্ত্রীর বহুস্মৃতি বিজড়িত শেষ অলংকারটির মায়াও ত্যাগ করেছেন। হঠাৎ তিনি যেন অতীত বৈভব এবং বিগত যৌবনকে ফিরে পান। আবার সহসা সবই শূন্যে মিলিয়ে যায়, "সহসা মনের দর্পণে নিজের প্রতিবিম্ব দেখিয়াছেন।—মোহ। কেবল তাঁহার নহে, সাত রায়ের মোহ ওই ঘরে জমিয়া আছে।" জলসাঘরের আলো যে আর জ্বলবে না তা বিশ্বম্ভর উপলব্ধি করেছিলেন বলেই আলো নিবিয়ে দিতে বলেছিলেন। অস্তগত মহিমা, সামন্ততন্ত্রের পতন যে অনিবার্য লেখক তা জানতেন, তথাপি সামন্ততন্ত্রের প্রতি মোহাবিষ্ট মানসিকতা তাঁর প্রকট। ধনতন্ত্রের আগমন অনিবার্য, মহিম গাঙ্গুলীর বিজলী বাতির কাছে জলসাঘরের ঝাড়লণ্ঠন যে পরাজিত হবেই—তা তারাশঙ্কর জানতেন। কিন্তু তিনি এমন হৃদয়হীন রূঢ় পরিবর্তন চান নি। তাই মহিম তাঁর লেখনীতে মহিমময় হয়ে ওঠেনি। "তারাশঙ্কর হয়তো সজ্ঞানে এই যুগপ্রবাহের বিরোধিতা করতে চান নি কিন্তু তাঁর মনস্তাত্ত্বিক প্রক্রিয়া খানিকটা অবচেতনভাবে নূতনের নির্মমতাকেই যেন প্রধানতঃ অভিব্যক্ত করতে চেয়েছে।" (২৬)

এই গল্পে শুধু রায়বাড়ির দরজাই বন্ধ হয় নি, বন্ধ হয়েছে অতীত আভিজাত্য মন্ডিত সামন্ততন্ত্রের রত্নদ্বার। ঋজুদর্শী, নিরপেক্ষ দৃষ্টি নিয়ে তারাশঙ্কর তা অঙ্কন করেছেন। "চাবুকের শব্দে গল্পটির চকিত উপসংহার যেন নিষ্ফল আক্রোশে একটি যুগেরই সমাপ্তি ঘোষণা করেছে।" (২৭)

সামন্ততন্ত্রের ভাঙনের চিত্র পাওয়া যায় "রঙীন চশমা" গল্পটিতে। সেখানে বিশাল অট্টালিকা ভগ্নপ্রায়, জমিদার চৌধুরী, ধর্মে বৈষ্ণব। পাঁচভাই, তার মধ্যে দু-ভাই এর বংশ নেই। মৃত এক ভাইয়ের পুত্রদ্বয় মাতুলালয়ে থাকে। নিষ্কর্মা ছোটকর্তা বড়ভাইয়ের কাছেই থাকে। এভাবেই ধ্বংসের চরম পর্যায়ে এসে উপস্থিত হয়েছে অতীতের সেই বিনয়ে, দানে, সম্পদে লব্ধ প্রতিষ্ঠ চৌধুরী বংশ আজ পতনের শেষ ধাপে। অবশ্য ধ্বংসের প্রত্যক্ষ কারণ উল্লেখ না থাকলেও ধনতন্ত্রের উত্থানই যে মূল কারণ তা অনুমান করলে ভুল হয় না।

এই পর্যায়ের আর একটি সার্থক সৃষ্টি তারাশঙ্করের "বন্দিনী কমলা" গল্পটি। রাজাহাটের বনেদী রায়বাড়ির লক্ষ্মীছাড়া বংশধরদের নিয়ে কাহিনীর সূত্রপাত। কিংবদন্তীর প্রতীকে আশ্রয় করে গল্পটির প্রেক্ষাপট গড়ে উঠেছে। কোজাগরী পূর্ণিমার রাত্রে জমিদার গোপীবল্লভের স্ত্রী মানিকবৌ লক্ষ্মীকে গৃহে বন্দিনী করে গঙ্গায় প্রাণ বিসর্জন দেন। কিন্তু কালের অভিশাপ থেকে রায় বংশ রেহাই পেল না; দারিদ্র্যের চরমসীমায় পৌঁছায়। সংসারে ব্যভিচার, অনাচার শুরু হয়। ঋণে জর্জরিত হয় জমিদার বাড়ী। এদিকে কালের অভিঘাতে শতাব্দীর রসনায় অবহেলিত তালাটি ক্ষয়ে একদিন খুলে গিয়ে শুধু ঝুলে থাকে; ঋণ থেকে বাঁচতে লক্ষ্মী বাঁধা ঘর খুলে পান একরাশি চুল, একখানি বিবর্ণ চাদর, একখানি নামাবলী। কালের অভিঘাত কাউকে ক্ষমা করে না, ধনতন্ত্রের উন্মেষ ও ব্যভিচারী জমিদার-এ দুইয়ের মধ্যে প্রাচীনকে বিদায় নিতেই হবে এবং তাতে যে লক্ষ্মীদেবীকে বন্দিনী করে রাখলেও রেহাই নেই—তা সুন্দরভাবে দেখানো হয়েছে।

আবার Feudal System কখনও কখনও নিজের শখ ও সাধ পরিপূর্ণ করতে সাধারণ দরিদ্র মানুষকে লোভাতুর, উদর-সর্বস্ব, নির্লজ্জ, বিবেকহীন করে তোলে তার জ্বলন্ত উদাহরণ 'অগ্রদানী' গল্পটি। জমিদার শ্যামাদাস বাবু অর্থ ও জমির লোভ দেখিয়ে পূর্ণ চক্রবর্তীকে এমন নিষ্ঠুর হবার সুযোগ দিয়েছেন। সামন্তগণ এভাবেই নিজেদের খেয়াল-খুশী ও স্বার্থ চরিতার্থ করতে সমাজে অবক্ষয় সৃষ্টি করেছে।

আবার প্রচুর অর্থ সঞ্চয় করলেও মানসিকতার পরিবর্তন হয়নি "পুত্রেষ্টী" গল্পের জমিদার গণেশ বাঁড়ুজ্জের। তাই পোষ্যপুত্রে মন ভরেনি; নিজ পুত্র কামনায় পরের ছেলেকে বলি দিতে উদ্যত হয়েছেন।

সর্বস্ব হারিয়ে অন্যের কাছে আত্মমর্যাদা কখনই হারাতে প্রস্তুত নন "মুখুজ্জে মহাশয়" গল্পে বিষ্ণু মুখোপাধ্যায়।

জমিদারী দাপট শূন্য, বিত্তহীন, নির্বিষ সাপের নিষ্ফল ফোঁস-ফোঁসানিকে প্রজারাও অবজ্ঞা করে—"সাড়ে সাত গন্ডার জমিদার" গল্পে বনবিহারী সরকারকে। তিনি কেবল বেলা শেষে পশ্চিম দিগন্তে তাকিয়ে থেকে দীর্ঘশ্বাস ও হাহাকার করেন। এ অবক্ষয় স্বয়ং তারাশঙ্কর লাভপুরেই দেখেছেন।

Landed Aristocracy বা জমিদারী আভিজাত্যের সঙ্গে Mercantile Capital বা উঠতি বণিক শ্রেণীর দ্বন্দ্বে কিছু জমিদার নিজেদের জমিদারীর মায়া ত্যাগ করে বা আরও অর্থের আশায় ব্যবসায়ে মনোনিবেশ করেছেন। এ ব্যাপারে —পুরোহিত, মুখুজ্জে মহাশয়, আরোগ্য, শেষ কথা প্রভৃতি গল্প উল্লেখ করা যেতে পারে।

সামন্তগণের অত্যাচার, মামলা-মোকদ্দমায় সর্বস্বান্তের চিত্র আছে। অন্যায় ভাবে জমিদারগণ প্রজাদের শোষণ, শাসন, জমি-জায়গা লুণ্ঠন করে গৃহদাহ পর্যন্ত করেছেন। "নটু মোক্তারের সওয়াল" গল্পে নটু বিহারী ও মহাভারত এভাবেই শোষিত হন। কঙ্কণার ধনী জমিদার প্রজাদের মাথায় পা দিয়ে চলতেন। অত্যাচারিত নটু সামান্য শিক্ষক থেকে জেদের বশে ওকালতি পাশ করে মামলায় জমিদারদের পরাজিত করেন। নটুর অর্থ, যশ, প্রতিপত্তি, প্রাসাদোপম অট্টালিকা দেখে প্রলুব্ধ হয়ে লজ্জা-শরম বিসর্জন দিয়ে জমিদারবাবু নটুর পুত্রের সঙ্গে বৈবাহিক সম্পর্কে আবদ্ধ হন। সামন্ততন্ত্রের অবক্ষয় এবং সামন্ত নিজ অস্তিত্ব রক্ষায় ধনতন্ত্রের সঙ্গে গাঁটছড়া কেমনভাবে বেঁধেছে তা সুন্দরভাবে তারাশঙ্কর উল্লেখ করেছেন। এই গল্পটিকে আশ্রয় করেই লেখক "দুইপুরুষ"-এর নাট্য রূপ দেন। কলকাতায় তা মঞ্চস্থ হয় এবং চরম মঞ্চ সাফল্য লাভ করেন।

সামান্য, দরিদ্র পাটনীকেও শোষণ করেছেন সামন্তগণ 'পাটনী' গল্পে। "সন্ধ্যামণি" গল্পে দ্বিজপদ শব ঘাটের ডাক নিয়েছে। জমিদারকে বাৎসরিক ১১০০ টাকা দিতে হয়। তাই সে মৃতদেহের জন্য ঘাট মাশুল ২ টাকা করে তোলা সংগ্রহ করে। জমিদারগণের শোষণের রসনা শ্মশানঘাট পর্যন্ত প্রসারিত।

সামন্তগণের চারিত্রিক স্খলন, ব্যাভিচার, অত্যাচার, আপন স্ত্রী হত্যা, পরস্ত্রীকে লোভ দেখিয়ে নিয়ে যাওয়া ইত্যাদি অপগুণ ও বর্তমান ছিল। এর ফলেও তাঁদের অবক্ষয় ও পতন ঘটেছে। যেমন "মা" (ফল্গু) গল্পটির জমিদার মহাবিষ্ণু সরকার সন্দেহের বশে নিজের প্রথমপক্ষের সুন্দরী স্ত্রীকে গলাটিপে হত্যা করেছেন। সেই পাপের বোঝা তিনি সারাজীবন বহন করে চলেছেন। দুই পুত্র থাকতেও নির্বংশ হয়েছেন। বড়টির প্রজা হত্যার দায়ে দ্বীপান্তর এবং ছোটটির স্বদেশী

আন্দোলনে যোগ দিয়ে ফাঁসি হয়, সরকার বাবুর হাতে কুষ্ঠ হয়। এইভাবেই পাপের প্রায়শ্চিত্ত করেছেন। ব্যাভিচার, লম্পট, মদ্যপ চরিত্রহীন সামন্তপ্রধান গল্প 'বিষধর', 'প্রতিমা' প্রভৃতি।

সামন্তযুগে সামন্তগণই গ্রামের শুভাশুভের, বিচারের বিধানদানে সর্বোচ্চ ছিলেন। বিচারকের ভূমিকায় অবতীর্ণ 'তৃষ্ণা' (রসকলি) গল্প; গ্রামপ্রধানের ভূমিকায় আসীন 'জন্মান্তর' 'সর্বনাশী এলোকেশী', প্রভৃতি গল্প এ প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য। সামন্তগণ থেকেই পরবর্তী সমাজবিবর্তনে সমাজতন্ত্রবাদী ব্যক্তিদের ঘটেছে আবির্ভাব। "বিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয় দশকের মহাযুদ্ধের পর তখন ভারতের গণ আন্দোলনের প্রথম অধ্যায় শেষ হইয়াছে, নূতন অধ্যায়ের সূচনায় রাশিয়ার আদর্শে অনুপ্রাণিত সমাজতন্ত্রবাদী যুবক সম্প্রদায়ের এক ষড়যন্ত্র আবিষ্কৃত হইয়া পড়িল।" [২৮] অহীন্দ্র ও এই যুবকবৃন্দের প্রতিই আকৃষ্ট—একই পথের পথিক।

ধনতন্ত্র/ধনতান্ত্রিক উৎপাদন

ভূমিকা ঃ- ধনতন্ত্র বলতে বোঝা যায় এমন এক ধরণের অর্থনৈতিক সংগঠন যেখানে উৎপাদনের সব উপাদান (জমি, শ্রম, মূলধন ও সংগঠন) ব্যক্তিগত মালিকানায় রয়েছে। মালিকানা ব্যক্তিগত বলে এই সব উপাদান মালিকদের দ্বারা উৎপাদনে ব্যবহৃত হয় এবং সব উৎপাদনের মূল লক্ষ্য ব্যক্তিগত মুনাফা অর্জন করা। মুনাফা লাভই ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থার অর্থনৈতিক ক্রিয়া কলাপের পিছনে প্রেরণা হিসেবে কাজ করে। অর্থনৈতিক জীবনে ব্যক্তির স্বাধীনতা থাকে, এই স্বাধীনতায় রাষ্ট্র বা সরকার হস্তক্ষেপ প্রায়ই করে না। তাই একে অনেক সময় অবাধ অর্থনীতি বলে।

যে উৎপাদন পদ্ধতিতে মূলধনের প্রাধান্য, মুনাফার উদ্দেশ্যে উৎপাদন, উৎপাদনের যন্ত্রপাতি ও উপকরণ গুলির উপর ব্যক্তিগত মালিকানা, মুনাফাকে নিয়ন্তর মূলধনরূপে খাটানো প্রভৃতি বজায় থাকে, তাকে ধনতন্ত্র বলে। ব্যক্তিগত মালিকানা, ভোগ করার স্বাধীনতা, কর্মোদ্যম ও ব্যবসায় সংগঠনের স্বাধীনতাকে অনেকে ধনতন্ত্র বলেন। ধনতন্ত্রে দেশের উপকরণগুলি কিভাবে বিভিন্ন ক্ষেত্রে নিয়োজিত থাকে, কি পরিমান, কি ধরনের দ্রব্যাদি উৎপন্ন হবে, এইসব নির্ভর করে দাম এবং মুনাফার উপর ঃ সংক্ষেপে দাম-মুনাফার পদ্ধতির উপর (Price-profit + Mechanism)। মুনাফার জন্যই উৎপাদন এবং মুনাফা দামের উপর নির্ভর করে। ভোগকারীরা নিজেদের পছন্দ অনুযায়ী দাম দিতে চান, তাঁদের পছন্দ অনুযায়ী সামগ্রী উৎপাদন করে বিক্রির দ্বারা মুনাফা হয়। যে ক্ষেত্রে যে শিল্পে মুনাফার হার অধিক, তার উৎপাদন বাড়ে, উপাদানগুলি সে দিকে নিয়োজিত হয়। এইরূপে দাম-মুনাফা ব্যবস্থাই সমাজে উৎপাদনের পরিমাণ, প্রকৃতি ও উৎপাদন গুলির নিয়োগের দিক নির্ণয় করে। লেনিনের মতে পুঁজিবাদী গণতন্ত্রে শোষণেরই প্রাধান্য—এই গণতন্ত্র আদতে সংখ্যা লঘুদের শাসন, সম্পত্তিবান এবং ধনীদের ব্যবস্থা—**"This Democracy is always hemmed in by the narrow limits set by capitalist exploitation and consequently always remains, in reality, a democracy for the minority, only for the propertied classes, only for the rich."** [২৯]

ধনতান্ত্রিক অর্থনীতি ঃ প্রচলিত শ্রেণীবিভাজন এবং আয়ের ক্ষেত্রের অসাম্য বজায় রাখে এবং উৎপাদনের উপকরণের বেসরকারী মালিকানা অক্ষুন্ন রাখে। সর্বাত্মক পরিকল্পনা অনুযায়ী রাষ্ট্র উৎপাদন ব্যবস্থাকে নিয়ন্ত্রণ করলো পুঁজিবাদী অংশীদারের এবং পরিচালকমন্ডলীর প্রয়োজনীয়তা থাকে না কারণ উৎপাদন ও বিনিয়োগের ক্ষেত্রে তাঁদের কোন ভূমিকা নেই। নিয়ন্ত্রিত পুঁজিবাদের দুর্বলতা হল উৎপাদনের উপকরণসমূহকে বেসরকারী লাভ ও মজুরীতে নিয়োজিত করা। মুনাফাই উৎপাদনের শর্ত এবং ক্রয়ক্ষমতা বৃদ্ধির সহায়ক। ক্রয়ক্ষমতা শিল্প উৎপাদনের বৃদ্ধিতে সহায়তা করে। অন্যদিকে মুনাফা-মজুরি সম্পর্ক উৎপাদনের বাধাও সৃষ্টি করে। কারণ মজুরি বৃদ্ধি পেলে মুনাফার পরিমাণ কমে যায়, উৎপাদনের উৎসাহও স্তিমিত হয় এবং উৎপাদনের উপকরণসমূহের সঙ্গে সমতা রক্ষিত হয় না।

ধনতান্ত্রিক উৎপাদনের পক্ষে এবং পরিকল্পিত অর্থনীতির বিপক্ষে যুক্তি হল—পরিকল্পিত অর্থনীতি হচ্ছে Muddled Economy বা বিশৃঙ্খল অর্থনীতি। ধনতান্ত্রিক অর্থনীতিতে স্বয়ংক্রিয় মূল্য-নির্দ্ধারণ ব্যবস্থা উৎপাদনকে সুষ্ঠভাবে নিয়ন্ত্রন করে উৎপাদন বৃদ্ধিতে সাহায্য করে। সুদক্ষ পরিচালন ব্যবস্থাকে অবাধ অর্থনীতি সাহায্য করে এবং ভবিষ্যৎ উন্নতির সংস্থান রাখে। কেন্দ্রীয় নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা নিখুঁত মূল্য ব্যবস্থা প্রদান করতে পারে না, উৎপাদনের গতিরুদ্ধ হয়। পরিকল্পিত অর্থনীতিতে বলপূর্বক ভোগের আকাঙ্ক্ষাকে সঙ্কোচন, অতিরিক্ত সঞ্চয়ে বাধ্য করা সম্ভব হলেও গণতন্ত্রে শক্তিশালী ট্রেড ইউনিয়নের প্রভাবে তা সম্ভব নয়। ধনতন্ত্রে অবাধ মূলধন সংগঠনের ব্যবস্থা আছে, যাই হোক না কেন অব্যবস্থার বিরুদ্ধে ধনতান্ত্রিক মজুরী অনেক সময় গণবেকারী ও দেউলিয়া প্রথাকে প্রশ্রয় দিয়ে দ্রুত উৎপাদনে বাধার সৃষ্টি করেছে। সেক্ষেত্রে কেন্দ্রীয় কর্তৃপক্ষ অনেক সময় জোরালো নেতিবাচক বিধিনিষেধ আরোপ করে উৎপাদনে ইতিবাচক উৎসাহ প্রদান করতে পারে।

অষ্টাদশ শতকের শেষভাগে ও ঊনবিংশ শতকের শুরুতে ইংল্যান্ডে ঘটে যায় শিল্প-বিপ্লব। শিল্প-বিপ্লবের ফলে উৎপাদন ব্যবস্থায় যুগান্তকারী পরিবর্তন সূচিত হয়। কায়িক শ্রমের পরিবর্তে যান্ত্রিক কলাকৌশলে উৎপাদন হতে শুরু হয়।

ফলে ধনতান্ত্রিক শিল্পায়ণ (Capitalist Industrialisation) পূর্ণাঙ্গ রূপ ধারণ করে। যার ফলশ্রুতি হল মালিকশ্রেণী অধিকতর বিত্তশালী হতে থাকে; বিত্তহীন শ্রমিক শ্রেণী অধিক মাত্রায় শোষিত হতে থাকে। সামন্তপ্রথা বা জমিদারী ব্যবস্থার অবক্ষয়ের সঙ্গে সঙ্গে কৃষক শহরে কর্মের সন্ধানে ভিড় করে। তাই গ্রামে কৃষকশ্রেণীর সংখ্যা ক্রমহ্রাসমান হয়। অথচ **"land, Labour & Capital** এই তিনের যোগে ধন সৃষ্টি হয়।" (৩০)

১৭৫৭ খ্রী: পলাশীর যুদ্ধাভিনয়ের মাধ্যমে বাংলা, বিহার ও উড়িষ্যার ক্ষমতা ধীরে ধীরে হস্তগত করে বৃটিশ ঔপনিবেশিক শক্তি। ১৮৫৭ খ্রী: সিপাহী বিদ্রোহের পর ইংল্যান্ড সরকার এদেশ তাদের বাণিজ্যিক শক্তিকে প্রশাসনিক ক্ষেত্র থেকে উৎখাত করলেও ভারতে উপনিবেশিক চরিত্রের পরিবর্তন ঘটায় নি। ফলে দেশীয় শিল্পের ধ্বংস ও শোষণ হয় প্রকট। নিজেদের দেশের তৈরী মাল এ দেশে ইংরেজরা যোগান দিতে থাকে। তাই বৃহৎ শিল্প তারা এদেশে প্রথমে স্থাপন করেনি। তাদের লক্ষ্য ছিল ভারতে সামন্ত-নির্ভর ধনতান্ত্রিক অর্থনীতি গড়ে তোলা। তারই জন্য বৃটিশগণ চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত, জমিকে ব্যক্তিগত মালিকানা হিসেবে স্বীকৃতি দেন। সেই সঙ্গে তারা দেশীয় শিল্পপতিদের জমিতে অর্থ লগ্নী করার জন্যে বিভিন্নভাবে উৎসাহ দিতে থাকে। ফলে বাংলাদেশের বেশ ধনী ব্যবসায়ী জমিতে অর্থ লগ্নী করে রাতারাতি জমিদার হয়েছেন, বড় শিল্পপতি হন নি। গ্রামের প্রাচীন ঐতিহ্যবাহী জমিদারদের অনেকেই অধিক রাজস্ব প্রদানে স্বীকৃত না হওয়ায় তাদের জমিদারী কেড়ে নেয় বৃটিশ সরকার এবং সেই জমিদারী চলে যায় সদ্য শহুরে নব্য ব্যবসায়ীদের হাতে। **"Greater Part of the provinces land holdings fell rapidly into the hands of a few city capitalists who had spare capital and readily invested it in hand."** (৩১) এরাই ছিল গ্রামবাংলার সর্বনাশের অগ্রদূত। জমিকেনা ও বেশী সুদ আদায় করে এরা ধনী হতে চেয়েছে। অন্যদিকে পঞ্জাবে চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত না থাকায় সেখানকার লোকেরা শিল্পে যথেষ্ট উন্নতি করেছে। কলকাতায় কয়লার ব্যবসা থাকলেও নির্মলশিব বন্দ্যোপাধ্যায় লাভপুরের জমিদারী ক্রয় করেছিলেন—তারাশঙ্কর তা উল্লেখ করেছেন।

যোগাযোগ ব্যবস্থা (রেল-১৮৫৩) স্থাপিত হওয়ায় বৃটিশ শিল্পপতিদের এদেশে আগমন ঘটে। দেশীয় বণিকদের সঙ্গে স্বার্থ-সংঘাত দেখা দিলেও উভয়ে একটি বিষয়ে একমত ছিল—তা হল শ্রমিক শোষণ। "ভারতের শিল্পক্ষেত্রের দাসত্বই হচ্ছে মূল কথা।" (৩২) ১৭৯৩ সালের পর জমি ব্যক্তিগত মালিকানার অধিকার লাভ করে। ফলে নব্য জমিদারদের খেয়াল খুশিমত খাজনা যোগাতে দরিদ্র প্রজা জমি বন্ধক, বিক্রি করতে বাধ্য হয়। নিঃস্ব হয়ে তারা দলে দলে জীবিকা অর্জনের আশায় শহরে আসে, অন্যদিকে প্রত্যন্ত গ্রামেও গজিয়ে ওঠে মহাজনী কারবার। জন্ম হল প্রাক্ ধনতন্ত্রের। জমিতে নব্য ধনী শ্রেণীর আবির্ভাব এবং গ্রামে তাদের অনুপ্রবেশ সামন্তগণ ভালচোখে দেখেন নি। ফলে শুরু হয় দ্বন্দ্ব ও সংঘাত। সামন্ততন্ত্র ও ধনতন্ত্রের এই দ্বন্দ্ব নিঃসন্দেহে একটি ঐতিহাসিক সত্য ঘটনা। বৃটিশ সরকার প্রবর্তিত বিভিন্ন ভূমি সংস্কার আইন বলে শোষণ ও বাণিজ্যের ক্রমবর্ধমান চাপে প্রাচীন জমিদারদের নাভিশ্বাস ওঠে; অস্তিত্বে সংশয় জাগে। এই সুযোগে নবোদিত ব্যবসায়ী ও মহাজন গোষ্ঠী জমির একচেটিয়া মালিকে পরিণত হন। শুরু হয় ব্যবসায়ী আর জমিদারের দ্বন্দ্ব। তারাশঙ্কর নিজেই তা উল্লেখ করেছেন—"সামন্ততন্ত্র ও জমিদারতন্ত্রের সঙ্গে দ্বন্দ্ব আমি দুচোখ ভরে দেখেছি। সে দ্বন্দ্বের ধাক্কা খেয়েছি। আমরাও ছিলাম ক্ষুদ্র জমিদার, সে দ্বন্দ্বে আমাদেরও অংশ ছিল।" (৩৩)

এই নব্য শিল্পপতি বা ব্যবসায়ীগণ জমিদারের সঙ্গে ভাল ব্যবহার কখনই করেনি। এমন কি ছল-চাতুরীর মাধ্যমে অনেক কুকর্ম করেছেন। এঁদের কোন ভাল দিক লেখক দেখতে পান নি। তাই হয়ত তিনি এঁদের প্রতি সুবিচার করেন নি। তাঁর সৃষ্ট ব্যবসায়ী চরিত্র কখনই সামন্ত-জমিদার অপেক্ষা উন্নততর নয়। "কালিন্দী"র বিমল বাবুর চরিত্র তার উৎকৃষ্ট প্রমাণ। গল্প হিসেবে 'জলসাঘর' এর মহিম গাঙ্গুলী এবং 'পুরোহিত' এ বিমলবাবু প্রমুখ উল্লেখযোগ্য। ব্যক্তিজীবনেও লেখক এই দ্বন্দ্বে জড়িয়ে পড়েছিলেন। নিজে ক্ষয়িষ্ণু জমিদার সন্তান, অন্যদিকে তাঁর স্ত্রী ধনী ব্যবসায়ীর সন্তান। ফলে অনিবার্যভাবেই দ্বন্দ্ব দেখা দিয়েছে তাঁদের দাম্পত্য জীবনে, "এই দ্বন্দ্ব আমার সারাটা জীবনের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িত—প্রায় সারাটা জীবন উপলব্ধি করে এসেছি।" (৩৪) এরই প্রতিচ্ছবি পাওয়া যায় "ধাত্রীদেবতা"য় শিবনাথ ও নাস্তির মধ্যে। দ্বন্দ্বে জয় হয় সামন্ততন্ত্রের। বাস্তবতঃ সামন্ত্রতান্ত্রিক সমাজের জগদ্দল পাথরকে সরিয়ে পুঁজিবাদী সমাজের প্রতিষ্ঠা যে প্রগতিশীল এই সত্য জ্ঞাত হলেও তারাশঙ্কর তা প্রকাশে দ্বিধান্বিত ছিলেন, কিন্তু তিনি ছিলেন স্বপক্ষে।

মালিকদের উদগ্র অর্থ তৃষ্ণা, অসংগঠিত, অসচেতন শ্রমিক-মজুরদের অসহায় আত্মসমর্পণ—ইত্যাদির সার্থক রূপকার তারাশঙ্কর। ধনতন্ত্রের নিশ্চিত আগমন ও অস্তাচলগামী সামন্ততন্ত্রের অবশ্যম্ভাবী মৃত্যুর পদধ্বনি তিনি শুনেছিলেন। আবার রাজনীতিজ্ঞ তারাশঙ্কর মনে প্রাণে স্বদেশী ছিলেন। বিদেশী শক্তির ধ্বংস হোক, সাম্রাজ্যবাদের বিনাশ হোক—তাও তিনি অকুণ্ঠচিত্তে প্রার্থনা করেছিলেন। অর্থাৎ তিনি একই সঙ্গে সামন্ততন্ত্র ও সাম্রাজ্যবাদ দুটোরই উৎখাত চেয়েছিলেন—"আমার বিচিত্র অভিজ্ঞতায় আমি দেখলাম তার শক্তি নাই, সে মুমূর্ষু শক্তি তার নাই, সে সক্রিয় নয়; শুধু আয়তন এবং ভাবটা একদা বিপুল ছিল বলেই ঘটোৎকচের দেহের মত সে জীবনের গতির পথ রোধ করে পড়ে আছে। ওর দেহে চাবুকের আঘাতে স্পন্দন জাগবে না। ওকে ভারি ধারালো অস্ত্রাঘাতে খন্ড খন্ড করে সরিয়ে সৎকার করতে হবে, চিতা জ্বালাতে হবে, শবদেহটা আগলে আছে বৈদেশিক রাজশক্তি; একটাকে সরিয়ে আর একটাকে রাখলে

চলবে না। দুটোকে এক সাথে সরাতে হবে। এক চিতায় দুটো যাবে।" (৩৫) এই মানসিকতার জন্যেই হয়তো তিনি জমিদারী রাষ্ট্রায়ত্ত করার সময় রাষ্ট্র-প্রদত্ত অর্থ গ্রহণ করেন নি।

১। মধ্যস্বত্ব শ্রেণী ঃ- বৃটিশ সরকারের দৃঢ় বিশ্বাস ছিল যে এ দেশে জমিদার ও তাঁদের সৃষ্ট মধ্যস্বত্ব শ্রেণীর ক্রমবিকাশের মাধ্যমে বৃটিশদের ভবিষ্যৎ নিরাপত্তা সুদৃঢ় ভিত্তির উপর থাকবে। তাই বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদ দেশীয় শিল্পে আয়কর বৃদ্ধি করে এবং কৃষি ও জমিদারীর উপর করভার ততোধিক কম করার পক্ষপাতী হয়, কারণ তাদের উদ্দেশ্য ছিল লভ্যাংশের বা মুনাফার অধিক মোহে দেশীয় ব্যবসায়ীগণ জমিদারী ক্রয় করবেন। অনেক বাঙালী ব্যবসায়ী এই মোহে পড়ে জমিদারী ক্রয় করেছিলেন। কিন্তু শহরে ব্যবসায়ী গ্রামে জমিদারী ক্রয় করলেও গ্রামের সাথে তাঁদের সংযোগ সুদৃঢ় ছিল না। না থাকাটাই স্বাভাবিক কারণ তাঁরা শহরে জীবন যাত্রায় অভ্যস্ত। শহরে বিলাসী জীবন যাপনের ব্যয়ভার নতুন জমিদারীর অন্তর্গত কৃষকদের উপর নিত্য নূতন কৌশলে টাকা আদায় করে মেটাতেন। নিজেরা ঠিক ঠিক সময়ে গ্রামে আসতে না পারার জন্যে স্থানীয় ব্যক্তিদের নির্দিষ্টকরে বাৎসরিক খাজনার ভিত্তিতে চিরকালীন 'পত্তনী' দান করেন। পত্তনীদারগণও আবার নির্দিষ্ট খাজনার ভিত্তিতে কিছু ব্যক্তিদের নিয়োগ করেন। এইভাবে জমিদার ও প্রজার মাঝে কয়েক শ্রেণীর খাজনা-ভোগী উপশ্রেণীর সৃষ্টি হয়। "আমরা বাংলাদেশে যে পাত্তনীদার; দর-পত্তনিদার ও সে-পত্তনিদারদেরকে দেখতে পাই, তাঁরা এবং জমিদারদের প্রতিনিধি ও কর্মচারীরাই প্রবাসী ভূস্বামী গোষ্ঠীর একমাত্র প্রতিনিধি।" (৩৬) এইভাবেই নিষ্কর্মা, সমাজে দুষ্টক্ষতের মত ক্ষুদে জমিদার হিসেবে ভূস্বামীর আবির্ভাব ঘটে। দিনে দিনে সংখ্যা বৃদ্ধি পায়, ১৮১৯ খ্রী: অষ্টম আইন জারী হবার পর মধ্যস্বত্ব ভোগীগণ আইনানুগ স্বীকৃতি লাভ করেন। ১৮৭২-৭৩ সালের প্রশাসনিক রিপোর্টে বলা হয় **"The practice of granting such under tenures has steadily continued until, at the present day, with the putnee and subordinate tenures in Bengal proper.....,but a small proportion of the whole permanently settled area remains in the direct possession of the zemindars."** (৩৭) আবার আবদুল্লাহ রসুল তাঁর কৃষকসভার ইতিহাস গ্রন্থে একই কথা বলেছেন, "দেড় লক্ষ জমিদারের নীচে নয় লক্ষ মধ্যস্বত্ব সৃষ্টি হয়েছে; অর্থাৎ তখন গড়ে এক একটি জমিদারী এস্টেটের মধ্যে ছয়টি করে মধ্যস্বত্বের আবির্ভাব ঘটেছে।" (৩৮) এরাই বৃটিশ সরকারকে বহুভাবে সাহায্য করেছিলেন। "১৮৫৭ খ্রীষ্টাব্দে ভারতীয় জনগণের মহাবিদ্রোহ এবং ১৮৫৯-৬১ খ্রীষ্টাব্দের বঙ্গদেশ ব্যাপী নীল বিদ্রোহে জমিদার, তালুকদার ও মধ্যশ্রেণী বৃটিশ শাসনকে বাঁচাইবার জন্য সকল শক্তি লইয়া উহার পার্শ্বে দন্ডায়মান হইয়াছিল।" (৩৯) এই মধ্যস্বত্ব শ্রেণী ধীরে ধীরে গ্রামবাংলার ভাগ্য নিয়ন্ত্রক, সাধারণ মানুষের ভাগ্য বিধাতায় পরিণত হন। অনেকে জমিদার বনে গেছেন। গ্রামীণ জীবনে সাধারণ মানুষকে এভাবেই ধনী হতে দেখেছেন তারাশঙ্কর। জমিদারও ক্ষয়িষ্ণু সামন্ততন্ত্রের ভগ্নস্তূপের উপর নিঃশব্দে ব্যবসায়ীদের মূলধন ক্রমবর্ধমান হয়েছে। স্ব-গ্রামে চেনা লোকেদেরও ধীরে ধীরে প্রতিষ্ঠিত হতে দেখেছেন তারাশঙ্কর।

তারাশঙ্করের কাল, একাল আর সেকালের সন্ধিক্ষণ। দুই মহাযুদ্ধের মাঝে স্থবির সমাজের ভাঙন, গ্রামীণ অর্থনীতি ক্রমশ পঙ্গুত্ব লাভ, মদমত্ত শিল্প সভ্যতার আবির্ভাব তিনি স্বচক্ষে দেখেছেন। এই মধ্যস্বত্ব শ্রেণী ইংরেজদের তোষণ-প্রাপ্ত হয়ে সমাজের সব সুযোগ সুবিধা, অবাধে শোষণ করেছেন। ফলে গ্রামীণ সমাজ জীবনে যে বন্ধন ছিল তা ভেঙে পড়েছে। যৌথ পারিবারিক প্রথার উপর চরম আঘাত আসে। গ্রামে সহযোগিতা ও সহমর্মিতার পরিবর্তে সৃষ্টি হয় প্রতিযোগিতা। সমষ্টিগত গ্রামীণ জীবনের পরিবর্তে উদ্ভব হয় স্বাতন্ত্র্যবাদ—**"The collective life of the village gave way to individualism."** (৪০)

কিন্তু বিশ্বযুদ্ধোত্তর কৃষি-সঙ্কট, বেকারত্ব, অর্থনৈতিক চাপ ইত্যাদি কারণে ভূস্বামী ও মধ্যস্বত্বভোগীরা অসন্তুষ্ট হন। তারাশঙ্করদের মত এই রাজা ও প্রজার মধ্যবর্তী শ্রেণী ইংরেজদের উপর ভীষণ অসন্তুষ্ট হন। সমস্ত সুযোগ সুবিধা বন্ধ হওয়ায় নিজেদের অস্তিত্ব, অর্থাগমের পথ রুদ্ধ হবার উপক্রম হল। নিজেদের অসহায় মনে করে এঁরাই প্রথম জাতীয়তাবাদী আন্দোলনে উৎসাহী হন এবং প্রগতিশীল পাশ্চাত্য সভ্যতার প্রতি উন্নাসিকতা প্রদর্শন করে ভারতীয় সনাতন ঐতিহ্যের প্রতি অনুরক্ত হন ও তাঁদের বৃটিশ বিরোধী মনোভাব জাগে।

১৭৯৩ খ্রী: চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত ঃ- নয়া জমিদার (ব্যবসায়ী শহরের)

↓

মধ্যস্বত্ব শ্রেণী — পত্তনিদার

↓ ↓

দর-পত্তনিদার

↓

সে-পত্তনিদার।

ব্যবসায়ী শ্রেণী

তারাশঙ্করের অনেক গল্প রয়েছে যেখানে বিভিন্ন ব্যবসায়ী বিদ্যমান। কখনও গল্পের প্রধান চরিত্রে, কখনও পার্শ্ব চরিত্রে অবস্থান করেছেন তাঁরা এবং গল্পের মোক্ষপ্রাপ্তিতে নানাভাবে সাহায্য করেছেন। নীচে ব্যবসায়ী - সংশ্লিষ্ট গল্পগুলির নাম চরিত্র, ব্যবসার প্রকৃতি ও গুরুত্ব সম্পর্কে আলোচনা ছকাকারে দেখানো যেতে পারে ঃ—

গল্পের নাম ও প্রকাশকাল	চরিত্র/স্থান	প্রকৃতি	গুরুত্ব
১। উল্কা ১৩৩৪সাল আশ্বিন	অনাথবন্ধু গাঙ্গুলী কলকাতা	বিরাট ব্যবসা/কোন ব্যবসা তার উল্লেখ নেই।	ব্যবসায়ী হলেও ভালোমানুষ/জ্ঞানী গুণীদের মর্যাদা দেন
	মিঃ ল্যাম্বার্ট	দালালগিরি।	গৌণ
২। আলো আঁধারি ১৩৩৯ বৈশাখ	হরিশবাবু ও অঁর পুত্র পরেশ	বিরাট ব্যবসায়ী/উপকরণের উল্লেখ নেই	গৌণ
৩। পুরোহিত ১৩৪১ বৈশাখ	বিমল রায় কলকাতা	কয়লার ব্যবসা/গ্রামে ৫০০ টাকা আয়ের জমিদারী আছে	উপপ্রধান চরিত্র/লোভী, উগ্র, অর্বাচীন।
৪। এ্যাও ১৩৪১ বৈশাখ	সুধীরবাবু/বালিগঞ্জ কলকাতা	কনট্রাকটর/ইঞ্জিনিয়ার রুরকী কলেজ থেকে পাশ করা	শ্বশুর জামাই মিলে ব্যবসা।
৫। জলসাঘর ১৩৪১ বৈশাখ	মহিম গাঙ্গুলী/গ্রাম	নব্যব্যবসায়ী/ব্যবসার উল্লেখ নেই।	মূল ঘটনার পরিসমাপ্তিতে এবং একটা কালের পতন ও অন্য কালের আগমনের আহ্বায়ক।
৬। হোলি ১৩৪৪ চৈত্র	কানাই মুখুজ্জে/গ্রাম	কয়লাখনির মালিক, পরে নরহত্যার দায়ে নিঃস্ব হয়ে যান। দালালগিরি করে জীবিকা নির্বাহ করেন।	অর্থের অহংকারে উত্তমর্ণকে গুলি করেন। বর্তমানে ভালো মানুষ।
৭। সুখনীড় ১৩৪৬ আশ্বিন	হরেন্দ্র/রেঙ্গুন	পাচক, ফেরিওয়ালা, দোকানদার, কয়লার ডিপো, কাঠের গোলা, পুরাতন লৌহলক্কর ইত্যাদি ব্যবসা করেছে বর্তমানে বিরাট ব্যবসায়ী।	ব্যাভিচারী জীবনযাপনে অভ্যস্ত
৮। তৃষ্ণা ১৩৫২ সাল	অমর/কলকাতা	বিরাট ব্যবসা/কোন ব্যবসা তার উল্লেখ নেই।	গৌণ
৯। মানুষের মন ১৩৬৫	ভবেন্দ্র/শহর	স্বদেশী করলেও পরে কনট্রাক্টর ও ধনী হন	প্রধান চরিত্র (নায়ক) আদর্শকে জলাঞ্জলি দিয়ে চরিত্রহনন করেছেন।
১০। চিনু মন্ডলের কালাচাঁদ ১৩৭১ সাল	নিত্য গোপাল (ঘোষ) মন্ডল/শহর বর্ধমান	বিরাট কনট্রাক্টর/ময়ূরাক্ষী ব্যারেজ ও ডি ভি সি তে কাজ করেছে/বর্তমানে কর্মরত।	গৌণ
১১। এক পশলা বৃষ্টি ১৩৭৫	চন্দ্র চৌধুরী/গ্রাম	কনট্রাক্টর	অর্থের অহংকারে অন্ধ হয়ে চরিত্র হনন করেছে।
১২। ময়দানব ১৩৫০	মালিকবাবু/নাম পদবী নেই। শহরে থাকেন	ফায়ার ব্রিক্স, ফায়ার ক্লে কলিয়ারীর মালিক।	স্বার্থপর মালিক পুত্র দায়িত্ব নেবার পরই ফণীর চাকরী নষ্ট করেছেন ফলে ফণীর জীবনের যবনিকা ঘটেছে।

১৩। ছলনাময়ী ১৩৪০ মাঘ	১। অমিয়বাবুর শ্বশুর ২। অমিয়বাবু/কলকাতা	কালিয়ারীর মালিক। প্রথমে কলিয়ারীর ম্যানেজার পরে কলকাতায় বিরাট ব্যবসায়ী	গৌণ
১৪। মূহুর্ত ১৩৪১	কালীবাবু	মেসের মালিক	গৌণ
১৫। মন্বন্তরবিষ ১৩৪২ মাঘ	সোমনাথ রায়/বিহার	প্রথমে চাকরী পরে কালুবাথানে লোহার কারখানা তৈরী করেন।	গৌণ
১৬। খাজাঞ্চিবাবু ১৩৪২	কোম্পানী/কলকাতা	কোম্পানীর ফায়ার ব্রিক্স কারখানা কলিয়ারী অঞ্চলে আছে।	গৌণ
১৭। আধলা ও পয়সা ১৩৪২ জ্যৈষ্ঠ	ভুলু দত্ত/গ্রাম	মহাজন ও ব্যবসায়ী	অত্যন্ত কৃপণ/ধনী হবার বাসনা প্রবল পিতৃহীন
১৮। শিবানীর অদৃষ্ট ১৩৭৫	স্বর্ণকার/নাম নেই গ্রাম	সোনার বাট বিক্রির দায়ে জেল হয়	হওয়ার জন্যেই শিবানীকে পরিচারিকার কাজ নিতে হয়। জীবনে গভীর বেদনা বহ দুঃখ ঘনিয়ে আসে।
১৯। শেষ কথা ১৩৫১ আশ্বিন	জমিদার/ব্যবসায়ী	দোকান/কলকারখানা	গৌণ

জলসাঘর ঃ- এই গল্পের জমিদার বিশ্বম্ভর রায়। এই অঞ্চলে তিনি "রায় হুজুর"। এই সম্বোধন নব্য ধনী মহিম গাঙ্গুলী সহ্য করতে পারেনি। তাই মহিম মনে মনে প্রতিজ্ঞা করে, "মরা পাহাড়ের চুড়ো ভাঙতেই হবে আমায়।" গাঙ্গুলীরা পুরুষানুক্রমে রায় দপ্তরের এলাকায় মহাজনী করেছে, রায়বাবুদের 'হুজুর' বলছে। অথচ কাঁচা পয়সার আমদানীতে অন্ধ হয়ে অতীতকে ভুলে গেছে, অবজ্ঞা করেছে ক্ষয়িষ্ণু জমিদারকে । এমনকি বাঈজী পাঠিয়ে অন্তিম আঘাত হেনেছে। জলসাঘরে বাঈজীর নাচে মত্ত হয়ে শিষ্টাচার, ভদ্রতা ভুলে মহিম জঘণ্য ব্যবহার করেছে। বনেদিয়ানা ও আধুনিকতার লড়াইয়ে অবশ্য ঐতিহ্যহীন আধুনিকতারই জয় হয়েছে।

মানুষের মন ঃ ভবেন্দ্র স্বদেশী আন্দোলনে যোগ দিয়ে স্বাধীনতার জন্যে সর্বস্ব পণ করেছিলেন, গান্ধীজীর সত্যাগ্রহে যোগ দেন। উপার্জন হীন বলে ধনীর কন্যা স্ত্রীর সঙ্গে বচসা ও গৃহত্যাগ করে ভাগ্যান্বেষণে বেরিয়ে এক মিলিটারী অফিসারের দৌলতে কনট্রাক্টর হয়ে বাড়ী, গাড়ি, নগদ অর্থের মালিক হন। পূর্ব জীবনের আদর্শ জলাঞ্জলি দিয়ে মদ্যপ হয়ে যান। স্ত্রী সুভাষিণী স্বামীকে ধনী দেখতে চেয়েছিলেন, কিন্তু আদর্শ বিকিয়ে মদ্যপ হয়ে নয়। ভবেন্দ্র গ্রামে ফেরেন। সুভাষিণী যখন শোনেন যে তাঁর স্বামী মাতাল তখন সুভাষিণী বর্তমান ভবেন্দ্রকে মৃত ভেবে আত্মহত্যা করেছেন। মৃত্যুর পূর্বে সুভাষিণী স্বামীর ফটোর দিকে তাকিয়ে বলেছেন, "শেষে প্রেতমূর্তি আমাকে ভয় দেখাতে এসেছ? তারপর সহাস্য তিরস্কার করলে ছিছি!"

একপশলা বৃষ্টি ঃ- চন্দ্র চৌধুরী "তো মুখ্যু লোক, আগে বাবুদের বাড়ী ইমারতের কাজ দেখতো। হঠাৎ যুদ্ধের সময় কিছু টাকা নিয়ে ওই" সময় সরকারী দু-চারটে ছোট কাজ করতে করতে সাহেবদের সুনজরে পড়ে গেলেন, "বাইসিকিল ছেড়ে ভট্‌ভটে আওয়াজ করা দু-চাকার গাড়ী কিনলে চন্দ্র চৌধুরী।" যুদ্ধের দৌলতে বেশ ধনী হলেও যে বছর সের ও আনির হিসেব উঠে গিয়ে কেজি ও পয়সার হিসেব চালু হয় সে বছরে চৌধুরী ব্যবসায় ফেল পড়ে, এবং ভীষণ অসুখে অর্থাভাবে মৃত্যু বরণ করেন। চরিত্রহীন মাতাল চন্দ্র জয়াকে কাছে রাখেন। জয়াকে তিনি ভালবাসেন। বাউরীর কন্যা হলেও চন্দ্র চৌধুরী বলতেন, "আমি চৌধুরী, তুই চৌধুরাণী,"। অর্থ উপার্জন করলেও কোনব্যক্তি যদি মাতাল, চরিত্রহীন হন তাহলে তাঁর অর্জিত অর্থ অচিরেই নাশ হয়ে যায়। সমাজে এ ধরণের চরিত্র অভিপ্রেত নয়।

ময়দানব ঃ- পুঁজিবাদের ব্যাপক প্রসার, ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদ ক্রমশঃ মানুষকে বড়বেশী কৃত্রিম করে তুলেছে, হৃদয় হয়েছে পাষাণ, নির্মম। অর্থের প্রাচুর্যে মালিকপক্ষ অনায়াসে বিস্মৃত হন শ্রমিকদের ন্যায়, নিষ্ঠা, দায়িত্বের কথা। যন্ত্র যখন শোষণের হাতিয়ার হয়নি, তখন প্রথম মালিক ফণী মিস্ত্রীর কাজে সন্তুষ্ট হয়ে বকশিস দিয়েছেন, ফণীও জীবন দিয়ে কারখানাকে ভালবেসেছে। তারপর মালিক পুত্রের হাতে কারখানা গেলে বৈদ্যুতিক যন্ত্র এসেছে; তাই কৌশলে মালিক

ফণীকে বিতাড়িত করেছেন। দানব যন্ত্র যেমন বৃদ্ধ ফণীকে গ্রাস করেছে লোহার দাঁতে, ঠিক তেমনি দ্বিতীয় মালিক বৃদ্ধফণীর সারাজীবনের নিঃস্বার্থ কর্মের কোন মূল্য বা মর্যাদা দেন নি। নিঙড়ে পিষে খোসা সার করে ফণীকে নিক্ষেপ করেছে দুর্ভাগ্যের গাঢ় অন্ধকারে। এই পর্যায়ে "খাজাঞ্চিবাবু" গল্পটিতে বদিবাবু চরিত্রটি স্মরণ করা যেতে পারে।

ছলনাময়ী ঃ- অমিয় বাবুর শ্বশুরের কয়লাখনি আছে, প্রাচীন ধনী। কিন্তু অমিয়বাবু বালীগঞ্জে পরে বিরাট ব্যবসা শুরু করেন। ধনী হন কিন্তু ধনী হওয়ার পেছনে কোন কারণের ইঙ্গিত নেই বা কোন ব্যবসা করেন তারও উল্লেখ নেই।

মন্থরবিষ ঃ সোমনাথ বাংলার ছেলে। তিনি বিহারে চাকরী করতে যান এবং সেখানে স্বাধীন প্রেমের বিবাহ করেন। পরে লোহার কারখানা গড়ে তোলেন বিহারের কালুবাথানে। উচ্চাকাঙ্খী, বিরাট ধনী ও বিশাল কারখানার মালিক হবার স্বপ্নে তিনি বিভোর।

শেষকথা ঃ- ব্যবসার মাধ্যমে পুঁজিবাদের আগমন ঘটলে এদেশের বেশ কিছু জমিদার ব্যবসার দিকে ঝুঁকে পড়েন। তখন জমি অপেক্ষা ব্যবসা হয় প্রিয়। তাই সাউ জমিদারগণ দোকান, কারখানা করে ব্যবসায়ী হয়েছেন। ফলে সাউদের যখন অন্য জমিদারের সঙ্গে সীমানা নিয়ে ফৌজদারী মামলা বাধে তখন প্রজাদের অবস্থা হয় "ষাঁড়ের পায়ের তলায় উলু ঘাসের মত।" কাঁচা পয়সার লোভে জমিদারগণ কারবারে যত্নশীল হয়েছেন— জমি বা প্রজাদের প্রতি দৃষ্টি রাখা বা কর্তব্য পালন করেন নি।

মহাজনশ্রেণী

প্রাক বৃটিশ মহাজনদের ঋণদানের ভূমিকা স্বতন্ত্র ছিল। কিন্তু জমিদারী ব্যবস্থা প্রবর্ত্তিত হবার পর এই মহাজন গোষ্ঠী সমাজে দ্বৈত ভূমিকায় আবির্ভাব হন। একদিকে ঋণদান অন্যদিকে একচেটিয়া শস্যের ব্যবসায়ী, অন্যদিকে জমি নীলাম, বন্ধক, বিক্রি করার আইন স্বীকৃত হবার পর মহাজনেরা কৃষকদের সাহায্যকারী ভূমিকায় অবতীর্ণ হলেন এবং অত্যাধিক সুদ আদায় করতে থাকেন। প্রদেয় অর্থ ও সুদ আদায়ের জন্যে প্রজাদের জমি ক্রোক, নীলাম করতে থাকেন। এই লাভজনক ব্যবসায় গ্রামবাসীদেরও উৎসাহী হতে দেখা যায়। "নূতন বৃটিশ শাসনে ঋণের দায়ে ঋণগ্রস্তের সম্পত্তি ক্রোকের ব্যবস্থা থাকায় ঋণগ্রস্ত কৃষকের জমি-জমা মহাজনদের গ্রাসে পতিত হইতে থাকে। .....মহাজন গোষ্ঠীরা এক নূতন প্রকারের ভূস্বামী শ্রেণীতে পরিণত হয়।" [৪১] "পয়সাই ইহাদের প্রাণ, পয়সাই ইহাদের অস্থি, মাংস। পয়সার জন্য ইহারা করতে পারে না এমন কাজ সংসারে নাই। " [৪২] "ভারতীয় সমাজে মহাজন আর ঋণ কোন নূতন ব্যাপার নয়। কিন্তু ধনতান্ত্রিক শোষণের এবং বিশেষতঃ সাম্রাজ্যবাদী শোষণের যুগে মহাজনের ভূমিকা এক নূতন রূপ ও নূতন তাৎপর্য গ্রহণ করিয়াছে।" [৪৩]

গুপ্তযুগে মহাজনের সঠিক চিত্র পাওয়া না গেলেও গুপ্ত - পরবর্তী যুগে মহাজনদের উল্লেখ পাওয়া যায়। কিন্তু আধুনিক যুগের মতো তদানীন্তন যুগে মহাজনী অত্যাচার এমন নিষ্ঠুর ও হিংসাপরায়ণ ছিল না। ভরদ্বাজ তাঁর ধর্মকোষে মহাজনদের উল্লেখ করেছেন—"যদি অধমর্ণ ঋণশোধে অসমর্থ হয় তাহলে তার সম্পত্তি বিক্রয় করে ঋণশোধ করা যেতে পারে এবং সেই সম্পত্তির মধ্যে জমি, খেত, বাগান, বাড়ী সমস্তই অন্তর্ভুক্ত।" [৪৪] তাহলে এই সময়েও জমি বিক্রয় বা বন্ধকের উল্লেখ পাওয়া যায়।

" ব্রিটিশ শাসনের পূর্বে গ্রাম সমাজে কৃষকেরা বিচাচরিত প্রথা অনুসারে কেবলমাত্র জমিচাষের অধিকার ভোগ করত, কৃষিজমি হস্তান্তরের অধিকার তাদের ছিল না।" [৪৫] তাই মহাজনদের ভূমিকা বা তাদের এত বারবাড়ন্ত হয় নি। জমি হস্তান্তর হত না বলে মহাজনের সংখ্যা যেমন বৃদ্ধি পায় নি তেমন গ্রামে রক্তাক্ত শকট চলেনি। এরপর আসে ইংরেজ শাসন। চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত দ্বারা জমিকে ব্যক্তিগত মালিকানা দান করে কৃষকদের জমি, ঘর, সব বিক্রির একটা সুবন্দোবস্ত করে। " ইংরেজ শাসক গোষ্ঠী একদিকে কৃষক জমির উপর কৃষকের পূর্ণব্যক্তিগত অধিকার প্রতিষ্ঠা করিয়া তাহাকে উহা দান, বিক্রয় বা বন্ধক রাখিবার এবং অন্যান্য সকল প্রকারে উহা হস্তান্তরের অধিকার দান করে। অপরদিকে ফসলের পরিবর্তে মুদ্রাদ্বারা রাজস্ব দিবার নিয়মের প্রবর্তন করে। এইভাবে কৃষকের জমি 'মহাজন' নামক এক নূতন শোষকের গ্রাসে পতিত হইবার পথ প্রস্তুত করা হয়"। [৪৬] তারপর থেকে মহাজনের সংখ্যা বৃদ্ধি ও ভূমিকা অত্যন্ত নগ্ন আকার ধারণ করে; জীবন্ত জহ্লাদসম সমাজ জীবনে আবির্ভূত হয়। ইংরেজগণ উপলব্ধি করেছিল যে মহাজন ও জমিদার শ্রেণীই হল তাদের শোষনের একমাত্র নিরাপদ হাতিয়ার এবং এদের মধ্যস্থতায় এদেশে নিজেদের আখের গোছানোর পথ সুপ্রশস্থ হবে। "মহাজনই হইল ধনতান্ত্রিক উৎপাদন ও মহাজনী মূলধনের সমগ্র শোষণচক্রের একটি অপরিহার্য মূলদন্ড স্বরূপ।" [৪৭]

তারাশঙ্কর লাভপুরে মহাজনদের অনেক কুকীর্তি স্বচক্ষে দেখেছেন। জমিদারদের মধ্যেও অনেকে মহাজনীকারবার জাঁকিয়ে করেছেন। মহাজনদের মধ্যে অনেকে জমিদার, বিরাট ব্যবসায়ী হয়েছেন। "জলসাঘর" এর মহিম গাঙ্গুলীরা পুরুষপরম্পরায় মহাজনী করে বিরাট ব্যবসায়ী হয়েছিলেন। তারাশঙ্করের অনেক গল্প আছে যেখানে মহাজনগণ বিচিত্র লীলায় লীলায়িত। মহাজনদের মধ্যে কেউ কেউ দোকান খুলেছে। দোকানের মাধ্যমে নিরক্ষর প্রজাদের বেশ ঠকানো যায়, কেউ আবার জমির লোভে মদের দোকান খুলেছে, সমাজে মাতাল তৈরী করে দেয় অনেককে। কেউ অসহায় দরিদ্র সংসারের অসুস্থ ছেলেকে ডাক্তার দেখানোর সামান্য দু'টাকা কেড়ে নিয়েছে। কেউ আবার নিজের বিধবা ভাগ্নীকে অনাথা ভেবেও তার শেষ সম্বল সোনার পোঁটলা নির্লজ্জের মতো হাত পেতে নিয়েছে। কাউকে দেখা যায় সরল মাষ্টার মশাইয়ের দুর্বলতার সুযোগ নিয়ে তাঁর সবচেয়ে ভালো জমিটা কিনে নিয়েছে কিংবা ডাকাতদের কাছে থেকে কমপয়সায় চোরাই মাল কিনেছে; ধর্মে বৈষ্ণব হয়েও মহাজনী কারবার করেছে। মারোয়াড়ী এখানে জাঁকিয়ে উচ্চহারে সুদের বিনিময়ে মহাজনী কারবার করেছে।

মহাজন - সংশ্লিষ্ট গল্পগুলি একটু দেখে নেওয়া যেতে পারে—

	গল্প/প্রকাশন	পাত্র/বৃত্তি	গুরুত্ব
১।	স্রোতের কুটো ১৩৩৪ আষাঢ়	রায়মশাই / মহাজন	পার্শ্বচরিত্র/গৌণ
২।	চোখের ভুল ১৩৩৫ ভাদ্র	গোকুল মোড়ল / তেজারতি	পার্শ্বচরিত্র হলেও Tragic রসমোক্ষনে যথেষ্ট সহায়ক হয়েছে।
৩।	শ্মশানের পথে ১৩৩৫ আশ্বিন	১। রসিক দত্ত / মহাজন ২। কাবুলীওয়ালা / দাদনী কারবার	উভয়েই গৌণ চরিত্র
৪।	শ্মশান বৈরাগ্য ১৩৪০ আশ্বিন.	মহিম বাঁড়ুজ্জে / মহাজন কুসীদজীবী	প্রধান চরিত্র। অর্থ মানুষের কি বিরাট পরিবর্তন করতে পারে তার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত মহিম বাঁড়ুজ্জে।।
৫।	মহামারী ১৩৪১ বাসন্তী সংখ্যা	বেঁটে দত্ত / দোকানদার	পার্শ্বচরিত্র।
৬।	মধুমাষ্টার ১৩৪০ অগ্রহায়ণ	হরিশ সাহা / মহাজন	সরল, ভালোমানুষ মধুমাষ্টারের শেষ সম্বল ২বিঘা উর্বর জমিটি কিনে নেয়। সুবিধাবাদী।
৭।	সুরতহাল রিপোর্ট ১৩৫০	হরেরাম পোদ্দার-মহাজন	গৌণ। ডাকাতের চোরাইমাল কিনত। একবার জেলেও যায়।
৮।	বিগ্রহ প্রতিষ্ঠা ১৩৫৮ আশ্বিন	১। গাঙ্গুলী মশাই / মহাজন ২। গোবিন্দ গোঁসাই / মহাজন	গৌণ। বৈষ্ণব অথচ মহাজনী কারবার করেন।
৯।	এ্যাও ১৩৪১ বৈশাখ	ধনপতিবাবু-মহাজন	সহকারী চরিত্র। জামাইয়ের সঙ্গে ব্যবসা করেন।
১০।	চন্ডীরায়ের সন্যাস ১৩৪৩ শারদীয়া দেশ	গিরীশ সাহা / মহাজন মদের দোকানদার - জমি কেনে	গৌণ। তথাপি গল্পের পট পরিবর্তনে সাহায্য করেছে।
১১।	একপশলা বৃষ্টি ১৩৭৫	সাধু খাঁ, দে, চাটুজ্জে তিনজনেই আড়তদার	ধান, চাল এর গদি আছে। সেজ দে চরিত্রহীন।
১২।	মহুরবিষ ১৩৪২-মাঘ	মারোয়াড়ী-কুসীদজীবী।	উচ্চ হারে সুদের কারবার

চোখের ভুল ঃ- গোকুল মোড়ল দু' দশ টাকার তেজারতি করে। গাঁয়ের মাতব্বর। বাবা ছিলেন ছিরাম মোড়ল। গোকুলের কীর্তনগানে অত্যন্ত সখ। প্রায়ই গান গায়। কিন্তু বিশু মোড়লের বিধবা কন্যা উমার প্রতি তার কুদৃষ্টি ছিল। গোকুল শঠ, প্রবঞ্চক, চরিত্রভ্রষ্ট। নিজে একদিন কুমতলবে উমার বাড়ীতে যায়। উমার চিৎকারে এক সন্যাসী হাজির হলে গোকুল তাকেই ধরে চিৎকার করে গ্রামবাসীদের ডেকে নিরীহ নির্দোষ সন্যাসীকে প্রহার দেওয়ায়।

শ্মশানের পথে ঃ- দুর্ভিক্ষ প্রপীড়িত গ্রাম; কঙ্কালসার মানুষগুলো। "যেন মৃতের রাজ্য বলিয়া ভ্রম হয়।" অথচ সেখানেও মহাজন, কাবুলীওয়ালার দাদনী কারবার জাঁকিয়ে বসেছে। জমিদারের পেয়াদাও ভয়াল-বিভীষণ রূপে ধ্বংস কামনায় উদ্যত। দরিদ্র পরিবারের কর্তা গোষ্টমোড়ল। বাবার আমলে অবস্থা ভালই ছিল কিন্তু গ্রাম্য শাসনে আর শোষণে দারিদ্র্যের চরম সীমায় পৌঁচেছে। শুধু গোষ্ঠ একা নয়। গ্রামের সুশ্রী আজ নেই। "থাকিবে কি করিয়া? পল্লীর শ্রী-ই যে গিয়াছে। মূল মারলে ফুল বাঁচিবে কি করিয়া?" তাই দাদন শোধ করতে না পারায় কাবুলীওয়ালা শকুনের মত গোষ্ঠর স্ত্রী দামিনীকে বলে, "তব তুম্ আসো, তুমকো লিয়ে যাবে।" মৃত কঙ্কালসার পরিবারটার উপর শকুনি, গৃধিনীর মত রসিক দত্ত মহাজনের আবির্ভাব। অসুস্থ মৃতপ্রায় ছেলেটাকে কবিরাজ দেখানোর জন্যে ধার করা দু' টাকাও দুর্বৃত্ত মহাজন গ্রাস করেছে। শ্মশানের কুকুরগুলো যেমন মৃতদেহের চারদিক ঘিরে ধরে, তেমনি মহাজন, কুসীদজীবী, কাবুলীওয়ালার দল গ্রামকে গ্রাম এভাবেই গ্রাস করতে উদ্যত হয়েছে। তারাশঙ্কর দেশ সেবার কাজে নানাগ্রামে ঘুরেছেন এবং এইসব অত্যাচার শোষণের জীবন্ত ও বাস্তব দৃশ্য প্রত্যক্ষ করেছেন।

শ্মশানবৈরাগ্য ঃ- অর্থই জীবনের একমাত্র লক্ষ্য সুদখোর মহিম বাঁড়ুজ্জের। " টাকা নিজের ঘরে বাড়ে না, টাকা বাড়ে পরের ঘাড়ে।" এই মন্ত্র ছিল তাঁর তাই মহাজনী কারবারে " কয়েক বৎসরেই চারিপাশে দশক্রোশের মধ্যে প্রায় অধিকাংশ ভূসম্পত্তি বাঁড়ুজ্জের কাছে ছিপে গাঁথা মাছের মতো আটকাইয়া গেল।" ইনকামট্যাক্স অপিসের শমনের তাড়নায় দূরসম্পর্কীয় দিদির বাড়ীতে আশ্রয় নেয় সে। বিধবা দিদির ঘাড়ে পা দিয়ে চর্ব্য-চূষ্য-লেহ্য-পেয় গ্রহণ করে বিনিময়ে দিদির অভাবের সংসারে এক পয়সাও সাহায্য করে না। দিদির অসুখে দিদিরই দেওয়া টাকা থেকে অর্ধেক আত্মসাৎ করে ডাক্তারকে ফি বাবদ দিয়েছে। দিদির মৃত্যুর পরে শ্রাদ্ধের বিরাট আয়োজন করেছে; পুরোহিতকে বলেছে, "টাকা বিষয়, ধন-দৌলত, আত্মীয়-স্বজন, কিছুই না, কিছুই সঙ্গে যায় না।" অথচ চশমখোর, মহিম শ্রাদ্ধের কয়েকদিন বাদেই শ্রাদ্ধের খরচ প্রায় সাড়ে পাঁচশো টাকার জন্যে হাহুতাশ করেছে, এমনকি বিধবা ভাগ্নীর দেওয়া গয়নার পুঁটলীটা রক্ত চোষা ভাম্পায়ারের মত তাড়াতাড়ি গ্রহণ করেছে। অভ্যাস মানুষকে কেমন ভাবে নিয়ন্ত্রণ করে তার জ্বলন্ত উদাহরণ এই গল্পটি। সংসারে একা মহিম, অথচ তার চাহিদার অন্ত নেই, "অভ্যাসই যে মানুষের অলঙ্ঘ্য স্বভাব হয়ে দাঁড়ায়, এই মানব সত্যেরই শিল্পরূপ শ্মশান বৈরাগ্য।" [৫৮]

স্রোতের কুটো ঃ- রায়মশাই জমি কেনে। সুবিধাবাদী।

মহামারী ঃ- দুর্ভিক্ষ, কলেরায় গ্রামের পর গ্রাম নিশ্চিহ্ন হয়ে যাচ্ছে। দোকানদার সুদখোর বেঁটে দত্ত সেই দুঃসময়ে কাউকে বাকীতে দ্রব্য সামগ্রী দিতে রাজী নয় কারণ যদি এই মহামারীতে অধমর্ণের মৃত্যু হয়। "বেঁটে দত্ত দোকান-দানী খুলিয়া নীরবে বসিয়া আছে। একটি মাত্র খরিদ্দার দাঁড়াইয়াছিল। দত্ত বলিতেছিল, দোকান আমি বন্ধ করে দিয়েছি বাপু। ধার তো দোবই না আর যা দিয়েছি—তারই জন্যে মাথায় মাথায় ভাবছি, ধর তাদেরই যদি কিছু হয় ।" দোকানে মাল থাকতেও সে কাউকে দেয়নি ।

মধুমাষ্টার ঃ- সৎ-নিষ্ঠাবান শিক্ষক বই ছাপানোর জন্যে বাধ্য হয়ে জমি বিক্রি করেছেন। হরিশ সাহা কৌশলে শিক্ষক মশাইয়ের শেষ সম্বল উৎকৃষ্ট দুই বিঘা জমিটুকুই আত্মসাৎ করেছে। এমন হরিশ সাহা গ্রাম বাংলায় বর্তমানেও শত শত রয়েছে। তারাশঙ্কর যেন অতীত ও বর্তমানের ঋজুদর্শী।

সুরতহালরিপোর্ট ঃ- হরেরাম পোদ্দার মহাজনী কারবারী। ডাকাতির চোরাই জিনিস অল্পদামে কিনত। শেষে ধরা পড়ে জেলে গিয়েছিল। চরিত্র ভ্রষ্ট, ভোলা চৌকিদার হয়ত হরেরামের কোন কুকীর্তির সংবাদ জানত যার দ্বারা হরেরামের ফাঁসি হতে পারত। তাই জেল থেকে বেরিয়ে ভোলার মৃত্যু সংবাদ শুনে হরেরাম বলে, "যাক ফাঁসি থেকে বাঁচলাম। বেঁচে থাকলে খুন করতাম।"

এ্যাও ঃ- কলকাতার মহাজন, ধনী। বর্তমানে জামাইয়ের সাথে যৌথ ব্যবসায় নেমেছে। জামাই ইঞ্জিনিয়ার। তাই জামাই আঁকেন নক্সা আর বিজ্ঞ শ্বশুর তা বাস্তবায়িত করেন।

চণ্ডীরায়ের সন্ন্যাস ঃ- চণ্ডীরায় তান্ত্রিক, নেশাগ্রস্ত। এই নেশার সুযোগ নিয়ে গিরীশ সাহা নিজের দোকান থেকে মদ খাইয়ে চণ্ডীরায়ের প্রায় সমস্ত জমিই আত্মসাৎ করেছে। গিরীশ মহাজনী কারবারেও সিদ্ধ হস্ত। এই সম্প্রদায়ের চরিত্র যে কত নীচ, জঘন্য হতে পারে, কত নির্মম, নির্দয় হতে পারে তার সুন্দর সংকেত দিয়েছেন তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়। " নতমুখে গোটা কয়েক পিঁপড়ে টিপিয়া টিপিয়া মারিয়া গিরীশ আবার বলিল, তবে না হয় এক কাজ করুন কত্তা, 'দলদলির' জোলের ওই পনের কাঠা জমিটা আমাকে দিয়ে দেন। আমার জমির পাশেই বটে, ওতেই না হয় আমি সেরে নেব।" এখানে গিরীশের নির্দয়ভাবে পিঁপড়ে মারার সংকেতে মহাজন সম্প্রদায় পিঁপড়ের মতই অজস্র নিরীহ প্রাণ যে নাশ করে থাকে তা লেখক সুন্দরভাবে তুলে ধরেছেন।

বিগ্রহ প্রতিষ্ঠা ঃ- হিন্দুদের কাছে যে কোন বিগ্রহ শ্রদ্ধার সামগ্রী এবং সেবার যোগ্য। "বিগ্রহ প্রতিষ্ঠা" গল্পের মহাজন গাঙ্গুলী টাকার লোভে এতই মোহান্ধ ও বাস্তবজ্ঞান রহিত হয়েছিল যার জন্যে তিনি বিগ্রহ বন্ধক রাখেন। এই বন্ধক রাখার উদ্দেশ্য ছিল যে অধমর্ণ টাকা পরিশোধ করবেই কারণ বিগ্রহের প্রতি অনেকেরই শ্রদ্ধা, ভয়, ভক্তি ইত্যাদি থাকে। গাঙ্গুলীর এই অভিনব লালসার চিত্র বাংলা গল্প সাহিত্যে বিরল।

এক পশলা বৃষ্টি ঃ- চাটুজ্জে, রায়, ঘোষ, সাধু খাঁ, দে—এঁরা সকলেই এককালে জমিদার ছিলেন, বর্তমানে জমিদারী না থাকলেও অনেক জমি-জমা আছে। চাটুজ্জে, দে, সাধু খাঁ—এঁদের ধান ও চালের গদি আছে। অনাবৃষ্টি ও দুর্ভিক্ষের দিনে চাল যখন ৭/৮ টাকা মন তখন এই আড়তদারবাবুগণ চাল ও ধান গুদামজাত করে কৃত্রিম অভাব সৃষ্টি করে দু'টাকা বারো আনা কেজি বিক্রি করে। এদের চরিত্রও ভালো নয়। জয়া বাউরী দরিদ্র হলেও শরীর স্বাস্থ্য ভাল থাকায় "সেজ দে এখনও তাকে ডাকে।"

৪ বিভিন্নবৃত্তি/ পেশাভোগী শ্রেণী

তারাশঙ্কর পল্লীবাংলার কথাকোবিদ। বিভিন্ন বৃত্তিভোগী মানুষের পরিচয় মেলে তাঁর বিভিন্ন গল্পে। লেখক কখনও রাজনীতির কাজে বা নিজ জমিদারীর স্বার্থে, কখনও বা গ্রামের দুরবস্থা বা মহামারী দূরীকরণের কাজে রাঢ় বাংলার পথে, ঘাটে প্রত্যন্ত গ্রামে ঘুরে বেড়িয়েছেন। তাছাড়া তিনি প্রায়ই কাটোয়া হয়ে কলকাতায় আসতেন। ফলে বিভিন্ন স্টেশনের নানা পেশা ভোগী মানুষের খুব কাছে এসেছেন ও দেখেছেন। তাদের জীবনের বিচিত্রলীলাই তারাশঙ্করের গল্পের মূল কান্ত। সমাজের বিভিন্ন শ্রেণী থেকেই এদের আগমন, কখনও এরা প্রধান ভূমিকায় কখনও বা পার্শ্বচরিত্রে অবতীর্ণ। বাউন্ডুলে থেকে শুরু করে স্থায়ী-হিসেবীদের ভিড় জমেছে গল্পে। এসেছে শ্রমজীবী, ব্রাত্য, যাযাবরের দল। মোটামুটি কে কোন পেশাভোগী হয়ে কোন গল্পে বিধৃত রয়েছে-তা নিম্নে বর্ণিত হল ঃ—

পেশা	গল্প	পেশা	গল্প
১। পন্ডিত মশাই	১) পন্ডিত মশাই	৪। গৃহভৃত্য/ঝি	১)আলো-আঁধারি।
	২) পিতাপুত্র		২) জলসাঘর
	৩) হরিপন্ডিতের কাহিনী		৩) পুত্রেষ্ঠী
	৪) গোপাল বাঁধের ইতিকথা		৪) সমুদ্র-মন্থন
			৫) হোলি
	১) প্রতিধ্বনি		৬) বন্দিনী কমলা
২। অধ্যাপক	২) সুখনীড়		৭) সনাতন
	৩) দীপার প্রেম		৮) মরামাটি
	৪) শিবানীর অদৃষ্ট		৯) সাড়ে সাত গন্ডার জমিদার
৩। শিক্ষক	১) মধুমাস্টার		১০) জায়া
	২) পদ্ম বৌ		১১) শিবানীর অদৃষ্ট
	৩) নুটু মোক্তারের সওয়াল	৫। উকিল	১) খড়্গ
	৪) ইতিহাস		২) আলো-আঁধারি
	৫) রাণুর বিবাহ		৩) রাখাল বাঁড়ুজ্জে
	৬) যাদুকরী		৪) মহুরবিষ
	৭) দেবতার ব্যাধি		৫) নুটু মোক্তারের সওয়াল
	৮) সাড়ে সাত গন্ডার জমিদার		৬) ইতিহাস
	৯) হেড মাষ্টার		৭) রাণুর বিবাহ
	১০) কালোমেয়ে		৮) শ্যামাদাসের মৃত্যু
	১১) জগন্নাথের রথ		৯) প্রহ্লাদের কালী
	১২) শিবানীর অদৃষ্ট		

৬।	পোষ্টমাস্টার	১) রঙীন চশমা ২) ডাক-হরকরা
৭।	সাহিত্যিক	১) জায়া ২) কান্না ৩) কয়েক ফোঁটা রক্ত ৪) অভিনয় ৫) ভুলোর ছলনা
৯।	পুলিশের গ্রাম্য গোয়েন্দা	১) বোবাকান্না ২) প্রত্যাখ্যান
১০।	সন্ন্যাসী	১) আলো-আঁধারি ২) ট্যারা ৩) একরাত্রি ৪) পাটনী ৫) আলোকাভিসার ৬) সাপুড়ের গল্প ৭) এ মেয়ে কেমন মেয়ে
১১।	গণিকা/বাঈজী	১) মেলা ২) নারী ৩) মুহূর্ত ৪) আলো-আঁধারি ৫) জলসাঘর ৬) মুকুন্দের মজলিস
১২।	গায়ক	১) কবি ২) তমসা ৩) কয়েকফোঁটা রক্ত
১৩।	বাউন্ডুলে	১) সন্ধ্যামণি ২) বাউল
১৪।	ড্রাইভার	১) ইস্কাপন ২) আখরী ৩) বিস্ফোরণ ৪) এ্যাকসিডেন্ট
১৫।	লাঠিয়াল	১) রায়বাড়ি ২) ব্যাঘ্রচর্ম ৩) মতিলাল
১৬।	এল, আই, সি এজেন্ট	১) ভ্রমন কাহিনী ২) আধলা-পয়সা
৮।	ডাক্তার — নেটিভ	১) শ্মশানের পথে ২) শ্রীনাথ ডাক্তার ৩) শাপমোচন ৪) সনাতন ৫) বোবাকান্না
	ডাক্তার — পাশকরা	১) পদ্মবৌ ২) ইতিহাস ৩) বোবাকান্না ৪) তৃষ্ণা ৫) যাদুকরীর মৃত্যু ৬) নারী ৭) ডাইনীর বাঁশি
১৭।	স্বদেশী	১) মা ২) মানুষের মন ৩) প্রত্যাখ্যান ৪) গোপাল বাঁধের ইতিকথা
১৮।	পটুয়া/বাজিকর/মূর্তি শিল্পী	১) প্রতিমা ২) রাঙাদিদি ৩) বেদেনী ৪) পিঞ্জর ৫) যাদুকরী ৬) কামধেনু
১৯)	স্যাকড়া	১) পিতাপুত্র ২) বিষপাথর ৩) পুরোহিত ৪) শিবানীর অদৃষ্ট
২০।	ম্যাজিস্ট্রেট/D.S.P.	১) পিতাপুত্র ২) ভুলোর ছলনা ৩) আখড়াইয়ের দীঘি
২১।	স্টেশন মাস্টার/গার্ড	১) চরহাটির স্টেশন মাস্টার ২) গার্ড চ্যাটারসনের কাহিনী ৩) তমসা
২২।	ডাইনী	১) ডাইনীর বাঁশি ২) ডাইনী
২৩।	ওস্তাদ/গুণীন	১) ডাইনীর বাঁশি ২) বাউল ৩) নারী ও নাগিনী ৪) ডাইনী ৫) যাদুকরীর মৃত্যু

২৪।	কাবুলীওয়ালা	শ্মশানের পথে
২৫।	দোকানদার	১) সন্ধ্যামণি ২) মেলা ৩) পুরোহিত ৪) চণ্ডীরায়ের সন্ন্যাস ৫) অগ্রদানী ৬) মহামারী ৭) রাজপুত্র ৮) দিল্লীকা লাড্ডু ৯) আখেরী ১০) দেবতার ব্যাধি ১১) জুয়াড়ী ১২) শঙ্করীতলার জঙ্গলে ১৩) আধলা ও পয়সা
২৬।	ঘটক	১) রাখাল বাঁড়ুজ্জে ২) সন্তান
২৭।	বাউল	১) রাইকমল ২) ডাইনীর বাঁশি ৩) বাউল ৪) কলকাতার দাঙ্গা ও আমি
২৮।	পুরোহিত	১) পুরোহিত ২) পঞ্চরুদ্র ৩) একরাত্রি ৪) রাখাল বাঁড়ুজ্জে
২৯।	ধর্মশালার নোকর	১) ভ্রমণ কাহিনী ২) বিষ্ণু চক্রবর্তীর কাহিনী
৩০।	ফেরিওয়ালা	১) মেলা
৩১।	জ্যোতিষী	১) উল্কা ২) মরামাটি
৩২।	ছবি আঁকা/বাঁধানো	১) আধলা ও পয়সা ২) শাপমোচন ৩) একটি মুহূর্ত ৪) রাঙাদিদি
৩৩।	ডাকাতি	১) স্রোতের কুটো ২) আখড়াইয়ের দীঘি ৩) যাদুকরী ৪) প্রহ্লাদের কালী
৩৪।	বাজীওয়ালা	১) মালাকার ২) আফজল খেলোয়াড়ী ও রমজান শের আলি
		৩) যাদুকরী
৩৫।	কলাকার	রূপসী বিহঙ্গিনী
৩৬।	নট/নাট্যকার	১) অভিনয় ২) ঘাসের ফুল ৩) কলাকসরৎ ৪) রাজপুত্র ৫) চন্দ্রজামাইয়ের জীবনকথা ৬) একরাত্রি
৩৭।	পাইকার	১) চিনু মন্ডলের কালাচাঁদ
৩৮।	পাহারাওয়ালা/চৌকিদার	১) আলো-আঁধারি ২) টহলদার ৩) ইস্কাপন ৪) প্রতিমা ৫) চৌকিদার ৬) মালাকার ৭) সুরতহাল রিপোর্ট
৩৯।	পিওন	১) সাবিত্রী চুরি ২) হেড মাস্টার
৪০।	রাণার	১) ডাকহরকরা
৪১।	মহুরী	১) স্রোতের কুটো ২) ব্যাধি ৩) রাখালবাঁড়ুজ্জে ৪) সমুদ্রমন্থন
৪২।	পুলিশ	১) কুড়ানো ঘড়ি; ২) কুলীনের মেয়ে
৪৩।	ভিক্ষাবৃত্তি	১) রাইকমল ২) কুলীনের মেয়ে
৪৪।	যাত্রাদলের কুশীলব	১) টহলদার ২) মহামারী ৩) রাধারাণী ৪) তৃষ্ণা ৫) শেষ অভিনয়
৪৫।	দারোগা	১) ব্যাধি ২) কুড়ানো ঘড়ি ৩) চোর ৪) ময়দানব ৫) সুরতহাল রিপোর্ট ৬) দেবতার ব্যাধি

৪৬।	চুরি	১) মরুরমায়া ২) ব্যাধি ৩) টহলদার ৪) কুলীনের মেয়ে ৫) চোরের মা ৬) চোর ৭) বোবাকান্না ৮) এ মেয়ে কেমন মেয়ে
৪৭।	চন্ডাল/পাটনী	১। সন্ধামণি ২) পাটনী ৩) বোবাকান্না
৪৮।	মুচি	১) অলো আঁধারি
৪৯।	বিজ্ঞান গবেষক	১। শ্যামাদাসের মৃত্যু
৫০।	জমাদার	১) আখড়াইয়ের দীঘি ২) চরহাটির স্টেশন মাস্টার ৩) দেবতার ব্যাধি ৪) বাবুরামের বাবুয়া
৫১।	লেখক	১) রাজা, রাণী ও প্রজা ২) কলকাতার দাঙ্গা ও আমি ৩) সন্ধ্যামণি ৪) ভুলোর ছলনা ৫) ভ্রমণকাহিনী ৬) বাণীমা ৭) হোলি
৫২।	দালালগিরি	১) হোলি ২) রাখাল বাঁড়ুজ্জে
৫৩।	মাহিন্দর/কৃষাণ	১) জায়া ২) এক পশলা বৃষ্টি ৩) উত্তর কিষ্কিন্ধ্যাকান্ড
৫৪।	স্টেশনের খালাসী	১) আলো আঁধারি
৫৫।	মাঝি	১) তারিণী মাঝি ২) কমল মাঝির গল্প
৫৬।	মামলাবাজ	চন্ডীরায়ের সন্ন্যাস
৫৭।	মিস্ত্রী	১) স্থলপদ্ম ২) ইমারত ৩) এক পশলা বৃষ্টি

এছাড়া অন্যান্য অসংখ্য পাত্রপাত্রী আছে যারা বিভিন্ন পেশায় নিযুক্ত। উল্লেখ্য যে তারাশঙ্করের ছোটগল্প বা উপন্যাসের প্রধান বৈশিষ্ট্য হল অসংখ্য চরিত্রের আগমন, যেন চরিত্রের চিত্রশালা। এক একটি গল্পে অনেক বর্ণের, ধর্মের, পেশার মানুষের ভিড়। অনেক গল্পে লেখক নিজেকে বিভিন্নভাবে মেলে ধরেছেন। কামার, নাপিত, ময়রা, সরকারী খনির ম্যানেজার ও কর্মচারী ইত্যাদি বহু চরিত্রের আগমন ঘটেছে তাঁর ছোটগল্পে।

তাঁর গল্পগুলি মূলতঃ জমিদার, মহাজন, মোড়ল প্রভৃতি যাঁরা শোষক, অন্যদিকে শ্রমজীবী বা কৃষিজীবী অথবা দরিদ্র জনতা—অনেক মানুষ নিয়ে তৈরী, যাদের পৃথক করে চেনা যায় না—তারা কেউই জটিল বা প্রবল মনস্তাত্ত্বিক দ্বন্দ্বে আন্দোলিত নয় কিন্তু পূর্ণাঙ্গ; যেন এক একটা যৌথ সত্তা। তারাশঙ্কর যেন ভাস্করের মত পাথর খোদাই করে জীবন্ত —মূর্তি বার করে আমাদের সামনে হাজির করেছেন।

তারাশঙ্করের ছোটগল্পগুলির মধ্যে থেকে তাদের বর্ণভিত্তিক ও অবস্থানভেদে স্তর বিন্যাস করে মোটামুটি ধারণা পাওয়া যেতে পারে—

সমাজে বর্ণ ভিত্তিক স্তর বিন্যাস—গল্পে

ব্রাহ্মণ	বৈষ্ণব	সদগোপ	ডোম	হাড়ি	মুচি	জমাদার	বাউরী	সাঁওতাল	মুসলমান	বাগদী	রাজপুত	মাঝি	বেদে	অন্যান্য
৫২	১৫	৪১	৩	৪	২	১	৭	২	৪৮	৪	২	২	৩	৩৯

সমাজে অবস্থানভেদে স্তর বিন্যাস—গল্পে

জমিদার	উচ্চবিত্ত	মধ্যবিত্ত	দরিদ্র	শ্রমজীবী	শিক্ষকতা	ভিক্ষাবৃত্তি	ভবঘুরে	বেশ্যাবৃত্তি	চৌর্যবৃত্তি	অন্যান্য
১৬	৯	৪৯	৫৬	৬	৪	৪	১০	৩	৬	২৭

গ. ব্রাত্যশ্রেণী

তারাশঙ্কর লোকায়ত জীবনের কথাকার। যারা বঞ্চিত, নিপীড়িত, অসহায়, দুর্ভাগা, অবক্ষয়ের শেষ সীমায় দণ্ডায়মান— তাদের চিত্রকর তারাশঙ্কর। নিম্নবিত্ত, আদিবাসী, যাযাবর, বেদে—প্রভৃতি যারা চলমান সভ্যতার আলোকস্পর্শ বঞ্চিত তাদের জীবনের ছবি তিনি এঁকেছেন বাস্তব ও জীবন্ত করে। এই হিসেবে সমকালীন লেখকগণের মধ্যে অগ্রগণ্য তিনি। বিভিন্ন সময়ে তারাশঙ্কর ভবঘুরের মত কখনও প্রয়োজনে আবার কখনও সমাজসেবার দিক থেকে দিগন্তে ঘুরে বেড়িয়েছিলেন সত্যদ্রষ্টা ঋষির মত। জনসাধারণের সঙ্গে খোলাখুলি মিশেছেন এবং যা দেখেছেন তাই গল্পে লিপিবদ্ধ করেছেন। ১৩৯৬ - এর তারাশঙ্করের জন্মতিথিতে লাভপুরে তারাশঙ্করের ছোটছেলে অবসর প্রাপ্ত ইঞ্জিনিয়ার সরিৎ বন্দ্যোপাধ্যায় বলেছিলেন, "বাবা যা দেখেন নি, বাবা তা লেখেন নি।" [৪১] হয়তো সেই জন্যেই দেখা যায় তারাশঙ্কর যখনই শহুরে জীবনের চিত্র আঁকতে গেছেন তখনই তাতে অভিজ্ঞতার অভাব বা ভাবের দৈন্য ঘটেছে।

বীরভূমের লাল কর্কশ শুষ্ক মাটির ব্রাত্য বাসিন্দারা যারা ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত ভাবে ফসিলের মত ছড়িয়েছিল, যাদের খবর কেউ রাখত না বা জানতো না তারাই তারাশঙ্করের লেখনীতে বাস্তবতায় রক্তমাংসের সজীবত্ব লাভ করলো। কল্লোল যুগের অন্যতম লেখক অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত যথার্থই লিখেছেন, "খুঁজে পেল সে মাটিকে, সলিল অথচ মহত্বময় মাটি, খুঁজে পেল সে মাটির মানুষকে, উৎপীড়িত অথচ অপরাজেয় মানুষ।" [৫০]

বীরভূমের গ্রামাঞ্চলে ইতস্ততঃ ছড়িয়ে থাকা অখ্যাত নাম না জানা মানুষগুলোকে একেবারে জীবন্ত করে গল্পে হাজির করেছেন— যেন বেদে, পটুয়া, মালাকার, লাঠিয়াল, কাহার, ডাকাত, ডোম, বাগদী, সাঁওতাল, গুণীন, ওস্তাদ ইত্যাদিদের এক বিরাট মিছিল। এদের মধ্যে অনেকেই আপন চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যে সমুজ্জ্বল এবং সকলেই রুক্ষ রাঢ়ের প্রতিবেশী। যেমন কালী বাগদী (আখড়াইয়ের দীঘি), রতনহাড়ি(ব্যাঘ্রচর্ম), দীনু ডোম (ডাকহরকরা), সাপুড়ে ও তার স্ত্রী (নারী ও নাগিনী), শম্ভু বাজিকর, শম্ভু-কিষ্টো বেদে (বেদেনী), বাবাজী (বাউল), ট্যারা বাউরী (ট্যারা) প্রভৃতি অসংখ্য গল্প। " তারাশঙ্করের গল্পে উপন্যাস খুঁটিয়ে পড়লে একটা বিশেষ অঞ্চলের সম্প্রদায় নির্বিশেষে বিশাল জনগোষ্ঠীর নৃতাত্ত্বিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ইতিহাস জানা যায়।" [৫১] আর এই কারণেই শ্রীযুক্ত অতুলচন্দ্র গুপ্ত মহাশয় এক সাহিত্য সভায় বলেছিলেন, "বঙ্গ সরস্বতীর খাসতালুকের মন্ডল প্রজা শ্রীতারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়।" [৫২]

রাঢ়ের চৌহদ্দীতে বন্দী, অশিক্ষিত, নিরক্ষর, কুসংস্কারাচ্ছন্ন, সীমাহীন দারিদ্র্যে পীড়িত, আদিমতায় পূর্ণ-অন্ত্যজ শ্রেণীর বন্ধু তারাশঙ্কর। তিনি দেখিয়েছেন আধুনিক পুঁজিবাদী অনুপ্রবেশের ফলে সভ্যতা যন্ত্রনির্ভর হয়ে পড়েছে, সামন্তজমিদার ধ্বংসের পথে দাঁড়াচ্ছে। প্রাচীন সংস্কার ও ব্রাত্যদের লোকসংস্কৃতির সঙ্গে নব্য ব্রাহ্মণ্য - সংস্কৃতির দ্বন্দ্ব অনিবার্য হয়ে উঠেছে। দরিদ্র, নিম্নজ, যারা অসহায়, অত্যাচারিত, শোষিত, অবহেলিত, অস্পৃশ্য, মূক, যাদের সমাজে কোন মান-মর্যাদা নেই, যাদের সব থাকতেও কোন কিছুতেই কোন অধিকার নেই তাদের কথাই লিখলেন দরদী লেখনী দিয়ে মরমী তারাশঙ্কর। যারা রুক্ষ-ধূসর বীরভূমে অর্ধাহারে, অনাহারে দিন কাটাচ্ছে তাদের কথাই লিখলেন তিনি। তারাশঙ্কর উপলব্ধি করেছিলেন যে "জীবদেহ আশ্রয় করেই জীবনের বাস।" এই কারণে ডঃ উজ্জ্বলকুমার মজুমদার বলেছেন, "তারাশঙ্করের

গল্প উপন্যাস শিল্পের চেয়েও জীবন যে বড় এই বোধকেই প্রতিষ্ঠিত করে।" [৫৩] শরৎচন্দ্রের পর বাংলার সমাজ জীবনের এক বলিষ্ঠ রূপকার হলেন তারাশঙ্কর। বীরভূম বাংলার ক্ষুদ্র সংস্করণ, বিন্দুতে সিন্ধুর স্থাপয়িতা তিনি। ক্ষণকালের দর্পণে নিত্যকালের জীবন সত্যকে ফুটিয়ে তুলতে তিনি এক অনবদ্য কারিগর। " নিজের জেলা বীরভূম, নিজের গ্রাম লাভপুর, এরই মধ্যে দিয়ে তারাশঙ্কর দেখেছেন সমগ্র ভারতবর্ষের গ্রামের নীচুতলার মানুষ, তাদের সমস্যা সুখ-দুঃখ, আশা-আকাঙ্খায় মেশানো পূর্ণ পারিবারিক জীবনের ছবি।" [৫৪]

সমাজের নিম্নশ্রেণীর জীবনবেদ লিখতে হলে তিনটি শর্ত পূরণের জন্যে লেখকদের যত্নশীল হতে হয়। যেমন " (১) তাদের জীবন-যাপন সম্পর্কে প্রত্যক্ষজ্ঞান। (২) তাদের মুখের ভাষায় পরিপূর্ণ অধিকার। (৩) তাদের যথাযথ চিত্রের পটভূমিকায় প্রাকৃতিক-গার্হস্থ, সামাজিক ও লৌকিক জীবনের অনুপঙ্খ আবেষ্ঠনী।" [৫৫] তাছাড় আর একটি গুণ থাকা প্রয়োজন তা হল এই অখ্যাতদের প্রতি গভীর আন্তরিকতা। এই অখ্যাত জনের বিষয়ে তারাশঙ্কর যে গল্প লিখেছেন তাতে তিনি শিল্প সুষমার পরিচয় দিয়েছেন বেশী। "গল্পে তিনি সংযমী, সংযতবাক-সন্দেহাতীত ভাবে অব্যর্থ।" [৫৬] এই জন্যেই শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় তারাশঙ্কর প্রসঙ্গে বলেছেন, " তিনি ততটা আর্টিস্ট নহেন, যতটা জীবন রসের রসিক"। [৫৭] বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরও তারাশঙ্কর প্রসঙ্গে বলেছেন, "গল্প লেখায় তুমি (তারাশঙ্কর) আধুনিক বাংলা সাহিত্যে অগ্রণীদের মধ্যে।" [৫৮]

সেই সব নীড়হারা, লক্ষ্যহারা, ছন্নছাড়ার দল, যাদের জীবন কেবল আদিম প্রবৃত্তির উদ্দাম উল্লাসে মত্ত সেই সব-বেদে, ডোম, কাহার, বাগদী, মাঝি, চন্ডাল, সাঁওতাল, রাজমিস্ত্রী প্রভৃতি যারা সৃষ্টির আদি থেকেই দুর্জয়, দুঃসাহসী, বন্য, বর্বর, উদ্দাম, যারা আধিভৌতিকে দৃঢ় বিশ্বাসী, তাছাড়া গোষ্ঠী বদ্ধতা, সামান্যতেই পূর্ণতা, যৌন-আকাঙ্খা, ঝগড়া-বিবাদ, সরলতা, মদ্যাসক্ত, বিবেকহীনতা যাদের জীবনের আর এক নাম—তাদের কথাই লিখলেন তারাশঙ্কর। এই মানুষগুলো কোনটা ভালো, কোনটা মন্দ তা জানে না, আত্মবিশ্বাস একেবারেই নেই, প্রবৃত্তি তাড়িত নিয়তিই হল এদের জীবনের সম্বল; জগৎ ও জীবন সম্পর্কে উদাসীন অথচ প্রাচীনতার প্রতিগভীর শ্রদ্ধা, এদের দৈনন্দিন জীবনের কী অফুরন্ত গতিবেগ রয়েছে—তা হৃদয় দিয়ে অনুভব করেছিলেন তারাশঙ্কর।

বিংশ শতকের শুরু থেকে জীবন ও মনের মধ্যে জটিলতা দেখা দেয়। মহাযুদ্ধোত্তর মুনাফালোভীদের লালসা, ব্যক্তি জীবনের বিকৃতি, বিলাসিতা, সীমাহীন বেকারত্ব, কালোবাজারীদের জন্ম হয়—সর্বত্র এক অসুস্থ পরিবেশ বিরাজ করেছে, ঠিক তখনই রাশিয়ার বিপ্লবের প্রভাবে শ্রেণীহীন, মেহনতি ও অবহেলিতদের প্রতি সানুকম্পা বা সহানুভূতি জাগলো মানবতাবাদী লেখকদের হৃদয়ে । যার ফলশ্রুতিতে এদেশে আবির্ভাব হল "কল্লোলযুগ"। কল্লোল যুগের বৈশিষ্ট্য যদিও অবহেলিতদের নিয়ে পদচারণা, তথাপি তারাশঙ্করের লেখনী অবহেলিতদের দূর থেকে নয়, তাদের পাশে গিয়ে, তাদের ধূলিমলিন চিহ্নগুলিকেও পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে তুলে ধরলেন। এখানেই তাঁর বিশেষত্ব। শৈলজানন্দ কয়েকটি খন্ডচিত্রের মাধ্যমে কিছু তুলে ধরেছেন ঠিকই, কিন্তু " তারাশঙ্কর তাকেই সমগ্রতায়, গভীরতায়, জীবন রহস্যের নিগূঢ় অর্থদ্যোতনায় একটি বিশালতা দিলেন। প্রথম থেকেই তারাশঙ্কর কারো প্রতিধ্বনি নন—প্রকৃতির সহজ শক্তির মতোই অরুগ্ন ও মৌলিক তাঁর শিল্পীসত্তা।" [৫৯]

শিবাজী যেমন মাতা জিজাবাঈ-এর কাছ থেকে গল্প শুনে ভবিষ্যতে রামায়ণ, মহাভারতের বীরের মত হওয়ার স্বপ্ন দেখেছিলেন, তারাশঙ্কর তেমনি মাতৃদেবীর কাছ থেকে অজস্র গ্রামীন গল্প শুনেছিলেন, যা কেবল রাঢ়ের মাটির ফসল। তিনি বলেছেন, " ছেলেবেলায় আমি যত গল্প শুনেছি, এত গল্প বোধ হয় খুব কম ছেলেই শুনতে পায়। আজও মনে পড়ছে, সেকালের গল্পগুলির মধ্যে অন্ততঃ আমি যাঁদের কাছে গল্প শুনেছি, তাঁদের গল্পের মধ্যে আশ্চর্যভাবে প্রাণপুরুষের সন্ধান ছিল।" [৬০] সামন্তগণ তাঁদের দাপট, শক্তি বজায় রাখতে অর্থ খরচ করে পশ্চিম ভারত থেকে এবং এদেশের এই ব্রাত্যদেরকে লাঠিয়ালের পদে বহাল করতেন, যা পরবর্তীকালে পুরুষপরম্পরায় চলে আসে। সামন্তদের বজায় রাখতে সামন্ত কর্তৃক সৃষ্ট এই লাঠিয়ালরাই সামন্তদের অবক্ষয়ের দিনে কাজ হারিয়ে সম্মান হারিয়ে পথে বসে। কিন্তু তাদের দেহে সেই জান্তব প্রবৃত্তির ধ্বংস হয় না। তাই লাঠিয়ালের কাজ হারিয়ে তারা ঠ্যাঙাড়ে, দস্যু, ডাকাতে পরিণত হয়। সামন্ত-প্রধান অঞ্চলগুলোতে তাই দস্যুতা বা চৌর্যবৃত্তি অত্যন্ত প্রকট। লাভপুরে তারাশঙ্করের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা তারই প্রমাণ বহন করে, " দু-তিন মাসের মধ্যে তিনচার ক্রোশের ভিতর চার-পাঁচটা ডাকাতি হয়ে যেত।" [৬১]

তারাশঙ্কর এই সমস্ত প্রাত্যহিক জীবনের লোমহর্ষক ও বাস্তব কাহিনী দেখেছেন, শুনেছেন এবং সেই প্রত্যক্ষ ঘটনাকে হুবহু লিখেছেন, " তিনি, তাঁর দেশ, রাঢ়ের ঐ বিশেষ অঞ্চলকে ভালবেসেছিলেন, ভাল করে দেখেছিলেন বলেই যে শুধু মহৎ সাহিত্য রচনা করতে পেরেছেন তাই নয়, ওর মধ্যেই তিনি সবদেশে সর্বকালের মানবজীবনে যা শাশ্বত সত্য, যা চিরকালীন সংঘাত, তাও যেমন দেখাতে পেরেছেন, তেমনি এদেশের জাতীয় জীবনের এক গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়ের আশা-আকাঙ্খার সংগ্রাম বিশেষ এক খন্ড কালের মহান ইতিহাসকেও ধরে রাখতে পেরেছেন

তাঁর রচনায়।" [৬২] রুক্ষ, কৃশ, লালমাটি, জলকষ্ট, কারখানার অভাবহেতু এবং শিক্ষার অভাবের জন্যে স্বভাব অপরাধিত্ব এখানে অতিমাত্রায় প্রকট; যাযাবর বলে এদের আদিমতা তীব্র কারণ এরা বন্ধনহীন। যেমন, "বেদেনী, নারী-নাগিনী, যাদুকরী, সাপুড়ের গল্প" ইত্যাদির নাম করা যেতে পারে। যা আমাদের অচেনা অদেখা, অভিজ্ঞতার বাইরে ছিল, তারাশঙ্কর তা আমাদের দৃষ্টি তথা হৃদয়গোচর করান। "বোধহয়, রবীন্দ্রনাথকে বাদ দিলে তাঁর মতো এত বড় দক্ষতার সঙ্গে ছোটগল্পের সীমাবদ্ধ আঙ্গিকের মধ্যে আর কেউ বিশাল বিচিত্রজীবনকে ফুটিয়ে তুলতে পারেননি।" [৬৩]

বীরভূমের গ্রামীনজীবন তাঁর সাহিত্যের লীলাভূমি। সারাজীবন ধরে তিনি এই ব্রাত্য বা যাযাবরদের জীবন পর্যবেক্ষণ করেছেন এমন কি স্বচ্ছন্দে মিশেছেন, তাই তাঁর লেখা এত জীবন্ত এবং মনোহরণকারী। "সমাজের সর্বনিম্নস্তরের জীবনযাত্রার রহস্যদ্বার সর্বপ্রথম উদ্ঘাটিত হয়েছে তারাশঙ্করের গল্পে।" [৬৪] বিখ্যাত সাহিত্যিক ও সমালোচক নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় তারাশঙ্করের ব্রাত্য প্রীতি সম্পর্কে বলেছেন, "তারাশঙ্কর মুখ্যতঃ জনসাধারণের শিল্পী, এই জনসাধারণ আবার নীচের তলার মানুষ।" [৬৫] বিশেষ করে বেদেদের প্রতি তাঁর অমোঘ কৌতূহল ছিল। 'আগুন', 'তামস-তপস্যা', 'নারী নাগিনী', 'বেদেনী' প্রভৃতি উপন্যাস ও গল্পে বেদের জীবনযাত্রা আচার-অনুষ্ঠান, কথাবার্তা বারবার দেখা গেছে। বেদেদের প্রভাব বীরভূমে অত্যন্ত বেশী। বেদেদের ব্যতিরেকে লাভপুর তথা বীরভূমের মনসা পূজা কল্পনা করা হত না। "বেদিয়ারা আসত। দেশী বেদিয়া সাপুড়ে। এরা সাধারণতঃ আসত বর্ষার সময় মাঠে আল কেউটে ধরতে। গ্রামে সাপ দেখিয়ে, গান গেয়ে ভিক্ষা করত, বাঁদরও নাচাত, আরও চলত। ওরা যেত মেদিনীপুর পর্যন্ত।" [৬৬] আর একাদল বেদেদের কথা বলেছেন, তারা ইরানী নামে খ্যাত। "ইরানীরা আসত, তাদের অস্তিত্ব শহরের লোকের কাছে সুপরিচিত। ছুরি, কাঁচি বিক্রি করে, মাথায় ডবলবেণীর উপর রুমাল বাঁধে, ঘাঘরা, পাঞ্জাবী পরে।" [৬৭] বেদেদের জীবনের খুঁটিনাটি বিষয় নিয়ে তারাশঙ্কর কতকগুলো ছোটগল্প ও উপন্যাস রচনা করেছেন। আদিম উপজাতির দৈহিক ও মানসিক বিভিন্ন প্রবৃত্তিকে অতি বাস্তব সম্মতভাবে উপস্থাপিত করেছেন। বিশেষকরে 'নাগিনী কন্যার কাহিনী', 'তামস-তপস্যা', প্রভৃতি উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। "নাগিনী কন্যার কাহিনী" রাঢ়ের লোক সংস্কৃতির এক সমৃদ্ধ অধ্যায়"। [৬৮]

আর একশ্রেণীর দেশীয় যাযাবরদের তিনি উল্লেখ করেছেন, যারা এদেশে বাজীকর বলে খ্যাত। "আর একদল দেশী যাযাবর আমাদের দেশে আছে। আমাদের অঞ্চলে বাজীকর বলে। এরা ম্যাজিক দেখায়। মেয়েরা নাচে, গান গায়, পুরুষেরা ঢোলক বাজিয়ে গান গায়।" [৬৯] 'মরুরমায়া', 'পিঞ্জর' ইত্যাদি গল্পে এদের নিদর্শন মেলে।

পটুয়া শ্রেণীও লেখকের খুব পরিচিত সম্প্রদায়। লম্বা পটে তারা কৃষ্ণলীলা, যমরাজার দরবার ইত্যাদি এঁকে দেখাত আর গান গাইত। "কবি" গল্পে দ্বিজপদ পটুয়া লেখকের বাল্যবন্ধু ছিল। তারাশঙ্কর দ্বিজপদর চেহারার নিখুঁত বর্ণনা দিয়েছেন। "সুন্দর চেহারা ছিল তার, তেমনি সে গান গাইত। লম্বা পট খুলে কৃষ্ণলীলা, রাসলীলা, গৌরাঙ্গলীলার পরপর সাজানো ছবি দেখিয়ে যেত, আর গান গেয়ে যেত—"আহা কি মধুর লীলা রে—" [৭০] পটুয়াদের মেয়েরাও পটে ছবি এঁকে বিক্রি করত। "রাঙাদিদি" গল্পে এর নিখুঁত প্রমাণ পাওয়া যায়। এ ছাড়া 'কবি' গল্পের সতীশ ডোম ছিল লেখকের চেনা মানুষ। সতীশের কবি হওয়ার আকাঙ্খা ছিল, তাও লেখক জানতেন। ডোম হল বাগদীদেরই সমগোত্রীয়। একদিন এক ঝুমুরদল লাভপুরের কাছে বটতলায় নামে, তাদেরই একটি মেয়ের কলেরা হয়। এই মেয়েটিই "কবি" উপন্যাসের বসন।

এভাবে অজস্র চরিত্র আছে যাদের সঙ্গে লেখকের আন্তরিক যোগাযোগ ছিল এমনকি হার্দিক সম্পর্ক ছিল। "যাদুকরী" গল্পের যে বাজিকর সম্প্রদায়ের উল্লেখ আছে, তাদের বেদেদেরই মতই চাল-চলন, অথচ ধর্মে তারা হিন্দু। বীরভূমের শীতল গ্রামের বাসিন্দা এরা। বর্তমানে এই সম্প্রদায় প্রায় অবলুপ্তির পথে, মাত্র চার/পাঁচ ঘর টিকে আছে।

বর্তমানে হাঁসুলি বাঁক সংলগ্ন মাস্তলী ও কাদপুর গ্রামে আজও প্রায় শ'তিনেক বাগদী বাস করে। এরা কাহার নামে পরিচিত, পাল্কী বয়। 'হাঁসুলি বাঁকের উপকথা' উপন্যাসে কাহারদের জীবনবেদ সুস্পষ্টভাবে চিত্রিত। "বাগদীদের মধ্যে যারা পাল্কী বয় তারা বাগদী কাহার, যারা বয় না তার শুধুই বাগ্‌দী।" [৭১] বাগদীরা মূলতঃ লাঠিয়াল, ভল্লারা এদেরই শাখা। 'পঞ্চগ্রাম', 'পদচিহ্ন', 'কালান্তর' উপন্যাসে বায়েনদের কথা আছে। "ভুবনপুরের হাট" এ কোড়া জাতিদের কথা আছে। "পাল ও সেন রাজাদের সময় থেকেই ডোমেরা বাংলায় বিভিন্ন রাজ্যে সৈন্যরূপে সমাদৃত ছিল।" [৭২] আজও বাংলাদেশে বিশেষ করে (বর্ধমান-বীরভূম-বাঁকুড়া) রাঢ় দেশে এই অনুন্নত শ্রেণীর সংখ্যা বেশী রয়েছে। "বাংলাদেশে বিভিন্ন শ্রেণীর মৎসজীবী, ধীবর, বাউরী, হাড়ি, ডোম প্রভৃতি জাতির আধিপত্য এখনও বেশী পশ্চিমবঙ্গে, বিশেষকরে রাঢ়দেশে। সাম্প্রতিক লোকগণনাতেও দেখা গেছে যে এই সব জাতির আধিপত্য এখনও বর্ধমান, বীরভূম, বাঁকুড়া হাওড়া, হুগলী, মেদিনীপুর অঞ্চলে (অর্থাৎ রাঢ়দেশে) প্রায় অক্ষুন্ন রয়েছে।" [৭৩]

রাঢ়ের আর একটি প্রধান জাতি হল সাঁওতাল। সাঁওতালদের আচার-ব্যবহার, পোষাক-পরিচ্ছেদ, ভাষা, সংস্কৃতি, দেব-দেবী, খাদ্য-খাবারের বর্ণনা, দেহের রং প্রভৃতি নিখুঁত ভাবে তুলে ধরেছেন তারাশঙ্কর তাঁর 'অরণ্যবহ্নি' উপন্যাসের দশ-বারো পৃষ্ঠায়। এই সকল জাতি ও উপজাতিদের দ্বারা বাঙালী সংস্কৃতি ভীষণভাবে প্রভাবিত। "বাংলার লোকশিল্প, বাঙালীর বলবীর্য বীরত্ব, বাংলার লোকোৎসব, নানাদিক থেকে এই সব জাতির কাছে ঋণী। কেন ও কি জন্য বাঙালীর সংস্কৃতিতে এত লৌকিক উপকরণের প্রাচুর্য, তার কারণ অনেকাংশে রাঢ়দেশের ইতিহাস থেকেই (উত্তরবঙ্গ ছাড়া) পাওয়া যায়। রাঢ়দেশে বিভিন্ন জাতির আনুপাতিক প্রাধান্য, সাঁওতাল প্রভৃতি আদিম জাতির সঙ্গে তাদের শারীরিক ও সাংস্কৃতিক সাদৃশ্য থেকে বাঙালীর সংস্কৃতির লৌকিক উৎসের আভাস পাওয়া যায়।" [৭৪] এইসব অন্ত্যজ জাতিদের সার্বিক জীবন যাত্রার এমন পরিচয় তারাশঙ্কর দিয়েছেন তাতে মনে হয় অদূর ভবিষ্যতে সভ্যতার ক্রমোন্নতি ঘটার সঙ্গে সঙ্গে এইসব জাতি-উপজাতিদের প্রাচীন জীবনযাত্রা জনসাধারণের অন্তরালেই পরিবর্তিত হতে চলেছে, তারই প্রামাণ্য তথ্য ভবিষ্যতে যে কোন জিজ্ঞাসুর কাছে লেখকের উপন্যাস ও ছোটগল্পগুলি অমূল্য উপকরণ হিসাবে কাজ করবে।

তারাশঙ্কর যেন বীরভূমের আয়না। তারাশঙ্করকে জানলে বীরভূমকে জানা হয়ে যায়। বিশেষ করে আদিম অমার্জিত জীবনলীলার সার্থক চিত্রকর হিসাবে। "পুরাতন আদিমতম বৃত্তি আর প্রবৃত্তির সংঘাত রহস্যকে আধুনিক কালের জীবনদৃষ্টির সহযোগে নবরূপ দিয়েছেন—এই অর্থে তারাশঙ্করের ছোটগল্পকে এপিক ধর্মী বলছি।" [৭৫] এই প্রসঙ্গে অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর 'বাংলা সাহিত্যের সম্পূর্ণ ইতিবৃত্ত' গ্রন্থে বলেছেন, "ছোট-বড়-ইতর-ভদ্র, ভূস্বামী, অভিজাত, ভূমিহীন রায়ত কৃষক—সকলের জীবনচিত্র আঁকতে গিয়ে তিনি যে বলিষ্ঠ ও প্রত্যক্ষ রীতির সাহায্য নিয়েছেন; ইদানীং টেকনিক সর্বস্ব বাংলা কথাকারেরা তাঁর নাগাল ধরতে পারবেন না। তারাশঙ্কর বাংলাদেশের গৌরব, ভারতবর্ষেরও প্রধান কথাকার।" [৭৬]

সমাজের একপ্রান্তে পড়ে থাকা অখ্যাত, অজ্ঞাত জনের সহমর্মী হয়ে তারাশঙ্কর পরিণত হলেন সার্বভৌম কথাশিল্পী। "ভারতীয় মানবসমাজের আদিস্তর যারা রচনা করেছে, পরবর্তীকালে আর্যসভ্যতার প্রসার ও প্রতিষ্ঠার ফলে যারা সমাজ বন্ধনের বাইরে অবজ্ঞাত অবহেলিত হয়ে পড়েছে, শিক্ষিত ও সভ্যতাভিমানী উচ্চমঞ্চের মানুষ যাদের দিকে মুখ তুলে তাকায়নি, তারাশঙ্কর বিশেষ করে সেই ব্রাত্য মানুষেরই কথাশিল্পী।" [৭৭]

ব্রাত্য, অন্ত্যজ যাযাবরদের নিয়ে তারাশঙ্কর অনেক গল্পও উপন্যাস লিখেছেন। তাদের মধ্যে তিনি প্রবৃত্তি তাড়িত আদিমতায় মিশ্রিত এক অত্যাশ্চর্য জীবনী-শক্তির লীলা প্রত্যক্ষ করেছেন। এরা যেন আদিম পৃথিবীর ফসিল। যেমন ঃ—

১। তারিণী মাঝি	ঃ জীবধর্মের জয়।
২। নারী ও নাগিনী	ঃ আদিম জৈব আসক্তির উপর মানসিকতার জয়।
৩। বেদেনী	ঃ অন্ধজৈবশক্তির মত্ততা।
৪। তিনশূন্য	ঃ বিকৃত-বীভৎস-ক্ষুধার্থ-কামার্ত, পশুস্বভাবের পাশবরূপ।
৫। যাদুকরী	ঃ নরনারীর বিচিত্র চরিত্র-চিত্রণ।
৬। মতিলাল	ঃ ব্যর্থ বাৎসল্যপ্রেমে পিতৃহৃদয় বেদনার্ত ও ক্ষতবিক্ষত।
৭। তমসা ও কান্না	ঃ জীববৃত্তি থেকে মানবসত্তায় উত্তরণ।
৮। রাঙাদিদি কবি, প্রত্যাবর্তন	ঃ প্রেমের বিচিত্র লীলা।
৯। চৌকিদার	ঃ অন্ধসন্দেহে দাম্পত্য বিচ্ছেদ।
১০। সুরতহালরিপোর্ট	ঃ অন্ত্যজস্তরেও সতীত্বের মর্যাদা রক্ষা।
১১। চোর	ঃ চৌর্যবৃত্তির বিচিত্রলীলা।
১২। চোরের মা	ঃ প্রকৃত মাতৃত্বের বিকাশ।
১৩। কামধেনু	ঃ প্রবৃত্তিই নিয়তি

১৪। ডাকহরকরা ঃ কর্তব্যের এক মহিমময় পূজারী।

১৫। ডাইনী ঃ স্নেহ, ভালবাসা বঞ্চিতা হতভাগিনীর মর্মন্তুদকাহিনী।

১৬। সমুদ্রমন্থন ঃ প্রেমের জয়।

এছাড়া 'জটায়ু', 'স্রোতের কুটো', 'স্থলপদ্ম', 'ট্যারা', 'ঘাসের ফুল' প্রভৃতি বহু গল্প রয়েছে। প্রত্যেকটি স্বকীয়তার মাধুর্যে সমুজ্জ্বল।

তারিণী মাঝি ঃ- ময়ূরাক্ষীর তীরে একগ্রামে তারিণীমাঝি তার স্ত্রী সুখীকে নিয়ে এক অনুপম সুখে দাম্পত্য জীবন শুরু করে। সন্তান নেই তথাপি কোন দুঃখ নেই। দারিদ্র্যের সঙ্গে সংগ্রাম করে প্রিয়তমা সুখীকে সুখী করতে দিনরাত ময়ূরাক্ষীর দুকূলপ্লাবী জলস্রোতে নৌকা চালায়। দেশে অনাবৃষ্টি দেখা দিলে সুখী তার সমস্ত গয়না বিক্রি করে তারিণীকে সেবা করে। নিজের জীবন বিপন্ন করে এক চতুর্দশী বধূকে জল থেকে উদ্ধার করে তারিণী বিনিময়ে সুখীর জন্যে কানের নথ চেয়েছে।

কিন্তু একদিন ময়ূরাক্ষীতে হুড়পা বান আসে। গ্রাম, ঘর, বাড়ি, সব প্লাবিত হয়ে যায়। সুখীকে বাঁচাতে গিয়ে অভিজ্ঞ সাঁতারু তারিণী ময়ুরাক্ষীর গভীর জলে পড়ে। মাটি খুঁজতে থাকে, পিঠে তার সুখী। সুখী "নাগপাশের মত তারিণীকে জড়াইয়া ধরিতেছে।" সুখীর কঠিন বন্ধনে তারিণীর দেহ যেন কঠিন হতে শুরু করে, "বুকের হৃৎপিন্ড যেন ফাটিয়া গেল।" তারিণী সেই মুহূর্তে নিজেকে বাঁচানোর তাগিদে। "দুই হাতে প্রবল আক্রোশে সে সুখীর গলা পেষন করিয়া ধরিল।" সুখীর দেহ ক্রমশ অসাড় হয়ে ধীরে ধীরে মৃত্যুর দিকে এগিয়ে গেল। সুখীর দৃঢ় বাহুবন্ধন শিথিল হল— "সেটা খসিয়া গেল। সঙ্গে সঙ্গে সে জলের উপরে ভাসিয়া উঠিল।" মৃত্যুর মুখোমুখি দাঁড়িয়ে থাকা মানুষের কাছে প্রেম, প্রীতি, ভালবাসা সব তুচ্ছ হয়ে যায়, কেবল নিজের জীবন রক্ষাই মুখ্য হয়ে ওঠে। "অন্ধ জৈবসত্তার তাগিদেই সুখীর গলা টিপে নিজেকে বাঁচবার চেষ্টা করে।" [৭৮] এইসব ব্রাত্য শ্রেণীর জীবনেও যে বাঁচার তাগিদ তা জৈবিক ধর্মেরই অনুসারী, তারই সঠিক রূপায়ণ সুখীর গলাটিপে তারিণীর বাঁচার তীব্র ঐকান্তিকতায়। এখানে উচ্চ-নীচ, নৈকষ্য-কুলীন, ব্রাত্য-শিক্ষিত-অশিক্ষিত সবই একাকার।

নারী ও নাগিনী ঃ- এক পা খোঁড়া, নেশাগ্রস্ত, সাপুড়ে, খোঁড়া সেখ। স্ত্রী জোবেদাকে প্রাণাধিক ভালবাসে, জেবেদাও খোঁড়া স্বামীকে হৃদয় উজাড় করে ভালবাসে। একদিন উদয়নাগ নামে এক সাপিনীকে ধরে এনে তাকে সিঁদুর পরিয়ে, নাকে ছিদ্র করে মিনি পরিয়ে দেয়। "তারপর হা-হা করিয়া হাসিয়া বলিল—ওয়াকে আমি নিকা করলাম জোবেদা, ও তোর সতীন হল।" খোঁড়া শেখের স্ত্রী জোবেদা সাপিনীকে ঈর্ষা করতে শুরু করে। জোবেদার অনুরোধে খোঁড়া সাপিনীকে জঙ্গলে রেখে আসে। কিন্তু সাপটি খোঁড়াকে ভুলতে পারেনি ও জাবেদাকেও সহ্য করতে পারেনি। তাই রাত্রির দ্বিপ্রহরে ঘরে ঢুকে জোবেদাকে দংশন করে পালাতে যায় কিন্তু খোঁড়া ধরে ফেলে, কিন্তু মারতে পারেনা হাঁড়িতে ঢেকে রাখে। এদিকে জোবেদার মৃত্যু হয়। খোঁড়া হাঁড়ি নিয়ে গভীর জঙ্গলে গিয়ে সাপটিকে ছেড়ে দেয় এবং বলে, " শুধু তোর দোষ কি, মেয়ে জাতের স্বভাবই এই। জোবেদাও তোকে দেখতে পারত না।" এ প্রসঙ্গে বালজাকের বিশ্ববিখ্যাত গল্প "A Passion in the Desert" স্মরণে আসে। দলভ্রষ্ট এক সৈনিক মরুভূমিতে এক বাঘিনীর সঙ্গে প্রেমে বাঁধা পড়েছিল। " শিল্প কুশলতার দিক থেকে এইটিই তারাশঙ্করের শ্রেষ্ঠ গল্প।" [৭৯]

বেদেনী ঃ- বহুভর্তৃক বেদেনী রাধিকা। বাল্যবয়সে স্বামীকে ত্যাগ করে সহজ সরল বলিষ্ঠ শম্ভুকে গ্রহণ করে। রাধিকা সংসারে প্রচলিত সংস্কার মানতে রাজী নয়। শম্ভুর সঙ্গে থেকে অর্থ, ভোগ তৃষ্ণা চরিতার্থ করেছে। শম্ভু বৃদ্ধ হলে অনায়াসে প্রথম স্বামী শিবপদের মতই শম্ভুকে ত্যাগ করার সংকল্প করেছে। কঙ্কালীতলার মেলায় "ছয়ফুটের অধিক লম্বা, শরীরের প্রতিটি অবয়ব সবল এবং দৃঢ়, কিন্তু তবুও দেখিলে চোখ জুড়াইয়া যায়"। সে তাই ব্যুঢ়োরস্ক কিষ্টো বেদের প্রেমে পড়েছে। আদিম জৈবিক তাড়নায় অন্ধ হয়ে গভীর নিশীথে নিঃশব্দে শম্ভুকে পরিত্যাগ করে উন্মত্ত যৌবনের প্রতীক কিষ্টোর কাছে চলে যায়। অন্ধ যৌবনের প্রবল আবেগে রাধিকা নিষ্ঠুরতার চরমে পৌঁছেছে। তাই শম্ভুকে ছাড়ার আগে ঘুমন্ত শম্ভুর তাঁবুতে কেরোসিন ঢেলে আগুন ধরিয়ে দেয় এবং "খিল খিল করিয়া হাসিয়া বলিল, মরুক বুড়া পুড়্যা।" জৈবলীলার দুরন্ত আকর্ষণে রাধিকা শম্ভুর ঘর ছেড়েছে। কোন নীতি-বোধ, শাস্ত্রজ্ঞান, প্রথা, ভব্যতা তাকে নিরস্ত করতে পারেনি, এমনকি এতদিনের জীবন সঙ্গীর তাঁবুতে আগুন লাগাতে দ্বিধা করেনি। " শুধু আপনার বেগেই আপনি ধাবিত হয়। তার স্বচ্ছন্দ স্বৈরিণী মূর্তিই বেদেনীতে স্বীকৃতি পেয়েছে। [৮০] সমালোচক নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় যথার্থই বলেছেন, " বেদেনী গল্পের রাধিকা যখন শম্ভুর তাঁবুতে আগুন দিয়ে কিষ্টো বেদের সঙ্গে নিরুদ্দেশের পথে যাত্রা করে, তখন ধর্মহীন, নীতিহীন জৈবশক্তির মত্ততা আমাদের মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'প্রাগৈতিহাসিক' গল্পটি মনে পড়িয়ে দেয়।" [৮১]

তিনশূন্য ঃ- দুর্ভিক্ষের পটভূমিকায় এক ভয়াল ও বীভৎসতার চিত্র এখানে রয়েছে। এখানে লেখক জন্মান্তরবাদকেও স্বীকার করেছেন। বাইরে ভদ্রতার মুখোশ অথচ পশুস্বভাবের মানসিকতা কাজে লাগিয়েছে এক ভদ্রলোক। তিনি রাতের অন্ধকারে দুর্ভিক্ষ প্রপীড়িত এক যুবতীকে কাপড় ও খাবারের লোভ দেখিয়ে ভোগ করে চলে যান। সময় চলে যায় কিন্তু ঘটনার ফলশ্রুতি বয়ে বেড়িয়েছে সেই হতভাগিনী। জন্ম দিয়েছে এক বিকৃত জান্তব পশুত্ব স্বভাবের সন্তানকেঃ বিকলাঙ্গ, সর্বদা মুখদিয়ে লালা ঝরে পড়ে তার। তবুও ল্যালার জীবনে জন্মসূত্রে এসেছে অতৃপ্ত যৌনক্ষুধা। তাই একদিন রাত্রে নর্দমায় ফেলে দেওয়া খাবারের সন্ধান করতে করতে এক অন্ধকার-ঘরে প্রবেশ করে চোদ্দ/পনেরো বছরের নিদ্রিত মেয়েকে দেখে। " পাশে আর দু'তিনটি ছেলে নিশ্চিন্ত নিদ্রায় তার সর্বাঙ্গের আবরণ শিথিল হয়ে তার নগ্ন রূপ মৃদু আলোক ছটায় অপরূপ লাবণ্যে মূর্ত হয়ে উঠেছে।" কামার্ত পশুর মতই সেই নিষ্পাপ বালিকার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে দুর্ভিক্ষের সন্তান, বিকৃত ব্যাধি ও অসুস্থ ল্যালা বা পশু মানব। যে অন্যায় ও কুৎসিৎ পরিবেশে সে পৃথিবীতে এসেছে তাতে এইরকম নগ্ন হিংস্র, ভয়াল, ভয়ঙ্কর ব্যবহারই প্রকাশ পায়— যা সমাজ জীবনে কখনই কাম্য নয়। তারাশঙ্কর এমন বীভৎস গল্প আর দ্বিতীয় লেখেন নি। এখানে পরোক্ষভাবে এই জঘন্য পাশব প্রবৃত্তির ধ্বংস কামনা করেছেন।

যাদুকরী ঃ- নিজেদের ঘরের ঠিক নেই, নেই দাম্পত্য জীবনে শান্তির লেশ, অথচ তারাই অপরের সংসারে, দাম্পত্য জীবনে আনন্দ বিধানের জন্যে জড়ি-বুটি; ঝাড়-ফুঁক ইত্যাদির ব্যবস্থা করে বেড়ায়, নিঃসন্তানদের সন্তানের ব্যবস্থা করে, অপরের প্রজন্মদের আগমন ঘটার ব্যবস্থা করে অথচ নিজেদের প্রজন্মের অভাবে সংসার ধ্বংস হয়ে যায়—এরাই হল যাদুকরী সম্প্রদায়। এই গল্পে যাদুকরী রমণী মুখুজ্জে-বাঁড়ুজ্জে পরিবারের বিরোধ মীমাংসার জন্যে বিভিন্ন অলৌকিক ব্যবস্থা করেছে। চোর শশী বাগদীকে গ্রেপ্তারের হাত থেকে বাঁচানোর জন্যে সেই মেয়েটিই কনস্টেবলের সম্মুখে অসঙ্কোচে নগ্নদেহে নৃত্য করেছে । সকলের কামার্ত চোখ দুটি লুব্ধ লালসায় তার দিকে চেয়ে থাকলেও মেয়েটি সহজ ও অবিকৃত ভাবে নেচে গেছে। উদাসীন, সমাজসংস্কার বন্ধনহীন, নির্লিপ্ত নির্বিকার উদার-মুক্ত এই সব ব্রাত্য শ্রেণী। সভ্যতার উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে কৃত্রিমতার যূপকাষ্ঠে আজ এরা প্রায় লুপ্ত পথের যাত্রী।

মতিলাল ঃ- নিঃসন্তান হেতু সন্তান কামনায় উদ্ভ্রান্ত মতিলাল ও ভুবন হাড়ি। দুজনেই কুৎসিত বিকট দর্শন। মতিলাল গাজনে ভালুকের সঙ সেজে ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের আনন্দ দিয়ে বেড়ায়। সন্তানের জন্যে বিভিন্ন কবিরাজ, ঠাকুরের তুক-তাক গ্রহণ করে, ভুবনকে মাদুলী পরায়, নিজেও পরে। নিষ্পাপ দুরন্ত বালকের মত মতিলাল অন্যের ছেলেমেয়েকে নিয়ে নিজের সন্তানহীনতার দুঃখ ভুলবার চেষ্টা করে। একদিন অন্যায়ভাবে প্রেসিডেন্টবাবুর আদেশে প্রহৃত হয় মতিলাল, এমনকি প্রেসিডেন্ট বাবুর আদেশে গ্রামে ঢোকা তার নিষিদ্ধ হল। মতিলাল ভেবেছে সে কুৎসিত বলেই তার ভাগ্যে জুটছে এত বিড়ম্বনা। তাই বাড়ী ফিরে এসে দুঃখের অভিঘাতে ক্ষতবিক্ষত হৃদয়ে সন্তান কামনার তাবিজ হাতের থেকে ছিঁড়ে ফেলেছে। ভুবন জিজ্ঞাসা করলে মতিলাল বলে, "আমাদের ছেলে আমাদেরই মতো কুচ্ছিত হবে তো ভোবন। কাজ নাই।" কুৎসিত কদর্য আবরণের আড়ালে মানবাত্মার চিরন্তনী উৎকণ্ঠা ফুটে উঠেছে।

কান্না ঃ- অন্ধ গায়কের কাহিনী। স্থান কলকাতার গড়ের মাঠ। পিতৃ-মাতৃহীন জনিকে এক চুড়িওয়ালী মানুষ করে। একটু বড় হবার পরেই জন্মের অভিশাপ তাকে ঘিরে ধরে। সমাজ বিরোধীদের সাথে মিশে কোমরে চাকু নিয়ে শুরু করে গলিপথে যাত্রা। হঠাৎ এক খ্রীষ্টান পাদ্রীর সুনজরে আসে এবং জনি নাম দিয়ে ফাদার তাকে কাছে রাখেন। হঠাৎ সমাজবিরোধী হালিমের দল টাকার লোভে চুড়িওয়ালীকে খুন করে। পুলিশকে জনি খবর দিয়ে হালিমকে ধরিয়ে দেয়। জেল থেকে ছাড়া পেয়ে হালিম জনিকে অন্ধ করে দেয়। মৃত্যুই হত তার, কিন্তু দেবরূপী ফাদার নিজের জীবন দিয়ে জনিকে রক্ষা করেন। ফাদারের আদর্শ নিয়ে অন্ধ জনি কলকাতার গড়ের মাঠে গান গেয়ে ভিক্ষে করে বেড়ায়— সে গানের সুরে পৃথিবী, আকাশ, বাতাস, গাছপালা, ময়দানের নীরবতাও কাঁদে। আদিম জিঘাংসার মধ্যে যারা অভিশপ্ত জীবন বয়ে নিয়ে ফেরে কান্না তাদের শুষ্কজীবনের মরুভূমিতে শান্তির প্রবাহ প্লাবিত করে।

রাঙাদিদি ঃ- বৃদ্ধ স্বামীর সঙ্গে যুবতী সরস্বতী পটুয়ার যৌন আকাঙ্খা চরিতার্থ না হওয়ায় স্থানীয় যুবকবৃন্দের কাছে সরস্বতী রঙ্গিনী লাস্যময়ী হয়েছিল। স্বামীর মৃত্যুর পর যুবকের দল তাকে সাঙা করতে চাইলে সরস্বতী যুবকদের বিবাহিত স্ত্রীদের তালাক দিতে প্রলুব্ধ করে। কিন্তু হঠাৎ সরস্বতী সকলের অজান্তে নিরুদ্দেশের পথে যাত্রা করে। সে কারও ঘর ভাঙেনি। আসলে রাঙাদিদির জৈবিক সত্তার উত্তরণ ঘটে দৈবসত্তায়। সে যাকে পেতে চেয়েছিল, যা প্রায় অসম্ভব, সেই দুর্লভ দর্শনেই আনন্দ পেতে শহরে দোকান খুলে বসেছিল।

কবি ঃ- নিতাই বাগদী জন্মে নিম্নজ হলেও কর্মে ছিল উচ্চ কোটীর। সে পেতে চেয়েছিল তার ভালবাসার পাত্রী ঠাকুরঝিকে। তার আকর্ষণেই নিতাই উদ্দাম-দুর্দম প্রাণের আবেগে উচ্ছল ছিল। কিন্তু সেই ঠাকুরঝি যখন রাজাকে নিকে (বিবাহ) করে তখন ব্যর্থ প্রেমের তাড়নায় কবি নীরবে সব ত্যাগ করে অজনার উদ্দেশে পাড়ি দিয়েছে। প্রেমিকা কাছে কাছেই থাকবে অথচ তাকে স্পর্শ করা যাবে না— এ ব্যথা ভীষণ মর্মন্তুদ তাই নিতাই দূরে চলে গেছে। বড় প্রেমের ধর্মই হল তাই।

প্রত্যাবর্তন ঃ- তিন তিনবার বিধবা হয়েও জেলের মেয়ে রমা পশুপতিকে পেয়ে গভীরভাবে সংসার পাতার আকর্ষণে প্রলুব্ধ হয়। দাম্পত্য জীবনে বারংবার ব্যর্থ নায়িকা রমা তাই হারিয়ে যাওয়ার আশঙ্কায় ভাবী স্বামীর কল্যাণে দেবী মঙ্গলচন্ডীর কবচ বেঁধে দিয়েছে; তথাপি তার গার্হস্থ্য জীবন ইহজীবনে আর হয় নি। ভাবী স্বামীর তৈরী কুটিরে তিলে তিলে ক্ষয়ে শেষে আত্মহত্যা করেছে।

চৌকিদার ঃ- অন্ত্যজ শ্রেণীর মধ্যে বন্ধনহীন নেশাসক্ত জীবন শান্তির সংসারে অশান্তির বাতাবরণ সৃষ্টি করেছে। সন্দেহ-বাতিক চৌকিদার প্রত্যহ রাতে গ্রাম পাহারা দিতে যাবার আগে স্ত্রীকে ঘরে রেখে নিজে শিকল তুলে দিয়ে যায়। একদিন মানসিক ভ্রান্তির বশে চৌকিদার সতীসাধ্বী কমলীকে সন্দেহ করে ত্যাগ করে। সুন্দর সাবলীল দাম্পত্য-সংসারে বিভিন্ন নেশা এই ভাবেই অশান্তি ডেকে আনে, বিচ্ছেদ ঘটায়।

সুরতহালরিপোর্ট ঃ- ভোলা বাউরী চৌকিদার। অত্যন্ত সৎ। তার স্ত্রী কড়ি। কড়ির স্বভাব চুরি করা। এই স্বভাবের জন্যে সে বহুবার স্বামীর নির্যাতন, প্রহার সহ্য করেছে তথাপি স্বভাবের পরিবর্তন করতে পারেনি। স্বামীর মৃত্যুর পর সুন্দরী কড়িকে অনেকেই বিভিন্ন ভাবে প্রলুব্ধ করে ভোগ করতে উদ্যত হয়েছে। তীব্র অন্নাভাব অর্থাভাব সহ্য করেছে তথাপি কড়ি ব্রাত্য হয়েও নিজ সতীত্বকে বিলিয়ে দেয় নি। তাই শয়তান মহাজন হরেরাম পোদ্দারের খপ্পরে পড়ার চেয়ে মৃত্যুকেই শ্রেয় মনে করে আত্মহত্যা করেছে। প্রবৃত্তি তাড়িত হয়ে আদিমতার কাছে আত্মসমর্পণ করেনি কড়ি বাউরী।

সমুদ্রমন্থন ঃ- 'তারিণীমাঝি' গল্পে জীববৃত্তির জয় হয়েছে, আর এই গল্পে জীবনের চেয়ে প্রেমই বড় বা মুখ্য হয়েছে। দুর্ভিক্ষ, অনাহারে জীর্ণা-শীর্ণা স্ত্রী অস্থিমজ্জা সার করে অসুস্থ স্বামীর পথ্যের জন্যে দ্বারে দ্বারে ভিক্ষে করেছে অথচ নিজের পেটকে রেখেছে শূন্য করে। এমনকি ডাক্তারের দেওয়া প্রেসক্রিপ্শন অনুযায়ী স্বামীকে মাংস খাওয়ানোর জন্যে গভীর রাতে জমিদার উমানাথবাবুর বাড়ীতে ছাগল চুরি করতে গেছে। ধরা পড়ার সময়েও সে বলেছে, " মাংসের ঝোল এঁকটুকুন কঁরে না পেঁলে ওঁ বাঁচবে না।" এইভাবে নিজের জীবনের কামনা-বাসনাকে তুচ্ছ করে অসুস্থ মৃতপ্রায় স্বামীর সেবায় আত্মনিয়োগ করেছে। সমাজের অন্ত্যজ স্তরে কদর্য ও কুৎসিত জীবনচর্যার মাঝেও প্রাণধর্মের কী অনির্বচনীয় মহিমা স্বমহিমার আলোকে সমুজ্জ্বল।

ঘাসের ফুল ঃ- কোলিয়ারীর ঘটনা। সাঁওতাল কন্যা চুড়কি কোলিয়ারীর রেজিস্টার সুদর্শন গায়ক বিনোদকে ভালবাসে। একদিন অপরাহ্ন বেলায় খাদে আগুন লাগে। সেই খাদের গর্তে দুই প্রাণী চুড়কি ও বিনোদ। বিনোদ আত্মরক্ষার তাগিদে চুড়কির আবেদনের কোন মর্যাদা না দিয়ে বাইরে বেরিয়ে আসে এবং আগুনের লেলিহান শিখা চুড়কিকে গ্রাস করে। যন্ত্রসভ্যতার যুগে উচ্চশ্রেণীর মানসিকতাও যন্ত্রের ন্যায় রূঢ় ও কদর্য হয়ে গেছে। তাইতো এত প্রগাঢ় ভালবাসা, গভীর প্রেম অনায়াসে তুচ্ছ বলে মনে করেছে বিনোদ। অথচ সহজ, সরল ব্রাত্য শ্রেণীর নায়িকা চুড়কি প্রেমের মর্যাদা দিতে কার্পণ্য করেনি।

তমসা ঃ- অন্ত্যজ শ্রেণীর মধ্যে রূপলোকের সাধনা করার অদম্য স্পৃহা থাকে। এই গল্পটির নায়ক পঙ্খী তারই উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। মনুষ্যলোক থেকে দেবলোকে উত্তরণের আকাঙ্খা। বীরভূমের অন্ধ ভিখিরি পঙ্খী বাস্তব নামেই তারাশঙ্করের গল্প সাহিত্যে এসেছে— যার সাধনা দেহাতীত সৌন্দর্যের আরাধনা। পঙ্খীর চেহারা বিকৃত " কুৎসিত চেহারা, চোখ দুটো সাদা সামনের মাড়িটা অসম্ভব রকমের উঁচু, চারটে দাঁত বেরিয়ে আছে, হাত-পা-গুলো অপুষ্ট অশক্ত।" অন্ধগায়ক সুরের মধ্যে দিয়েই প্রাণ ও জগতের সৌন্দর্যকে স্পর্শ করে। এই বীভৎস ঊনমানবটির অন্তরে যে স্বর্গীয় প্রেম সুধা ছিল তা সংগীতের মাধ্যমেই প্রকাশ করেছে।

আদি নিষাদ ও দ্রাবিড় জাতি — বীরভূম তথা রাঢ়ের ব্রাত্যশ্রেণী

বীরভূমে প্রাচীনকাল থেকেই নানা জাতি বসবাস করে আছে। বর্ধমান, মেদিনীপুর, বাঁকুড়া ও বীরভূমের মধ্যেই বেশী জাতি ও উপজাতি আছে। এদের চাল-চলন রীতি-নীতি, আচার-ব্যবহার, ধর্মীয় ও লৌকিক সংস্কৃতি প্রভৃতি বিষয়ে বিস্তর ফারাক বিদ্যমান ছিল। যদিও বর্তমানে সভ্যতার উন্নতির পাশাপাশি সংযমের বাঁধন অনেকটাই শিথিল হয়ে পড়েছে। বিনয় ঘোষের পশ্চিমবঙ্গের সংস্কৃতি, H. H. Risley- The Tribes & Castes of Bengal-Vol-I, II এবং ননীমাধব চৌধুরীর "ভারতবর্ষের অধিবাসীর পরিচয়, গ্রন্থ চতুষ্টয়ের উপর নির্ভর করে যে ধারণা পাওয়া যায় তা নিম্নে বর্ণিত হল ঃ-

বাগদী ঃ- অনার্য, প্রাচীনতম অধিবাসী। বর্তমানে হিন্দু, পূর্বে ডাকাতি ও লাঠিয়াল হিসেবে প্রসিদ্ধ ছিল, বর্তমানে চাষবাস, মাছধরা, ও নৌকাচালনাই প্রধান বৃত্তি। কেউ কেউ অবশ্য ডাকাতি আজও করে। এদের অনেকগুলি উপবিভাগ আছে। যেমন " তেঁতুলিয়া, লেটরা, ভল্লা, পার্শ্ববর্তী বাঁকুড়া জেলায় কশাইকুলিয়া, ডুলিয়া, মাছুয়া, গুলিমাঝি, ডাঁরামাঝি, কুশমাটিয়া, মাটিয়া বা মল্লা মাটিয়া ইত্যাদি।" [৮২]

লেটরা ঃ- লেটরা সম্প্রদায় নিজেদের উঁচু বলে দাবী করে। বাগদীদের সাথে নিজেদের ছেলেমেয়ের বিয়ে দেয় না। এদের অনেকেই চৌকিদারী করে। ভন্নারা পূর্বে ডাকাতি করত বর্তমানে চাষবাস করে, কিন্তু সুযোগ পেলেই দস্যুতা বৃত্তি অবলম্বন করতে বাধে না। লেটরা সম্প্রদায় ধর্মরাজ ও মনসার পূজো করে। ধর্মরাজকে তাড়ির ভোগ দেয়।

ডোম ঃ- লাঠিয়ালবৃত্তি ও ডাকাতি প্রধান পেশা ছিল। বর্তমানে ঝুড়ি তৈরী ও চাষবাস করে, মাছধরে, নৌকা চালায়— বাগদীদের সমগোত্রীয়। এদের মধ্যে অনেকে ছুতোর ও কুমোরের কাজ ও চৌকিদারী করে।

হাড়ি ঃ- চুরি-ডাকাতি করত। বর্তমানে এদের অনেক শাখা বিদ্যমান। যেমন (ক) ভুঁইমালী/চাষবাস করে। (খ) ফুলহাড়ি/ধাইয়ের কাজ করে। (গ) মেথর/ঝাড়ুদার। (ঘ) কাহার/পাল্‌কী বয়। Sir Graves Haughton তাঁর বাংলা-সংস্কৃত অভিধানে বলেছেন, " যে শব্দটি স্কন্ধ > কাঁধ + ভর = কাহার অর্থাৎ যে ঘাড়ে বোঝা বহন করে।" [৮৩] হাড়িদের অনেক উপবিভাগ আছে।

বাউরী ঃ- শীর্ণ, ক্ষুদ্রকায়, অপটুদেহী, কৃষ্ণবর্ণ। ক্ষেত-খামারে মজুরের কাজ করে। মেয়েরা গৃহস্থের বাড়িতে পরিচারিকার কাজ করে। এদের অনেকে বর্ধমান-হুগলী জেলায় খেত-খামারের কাজ করতে গিয়ে পুরুষানুক্রমে স্থায়ী ভাবে বাস করছে। "এদের নয়টি উপবিভাগ আছে। যেমন— মল্লভূমিয়া, শিখরিয়া বা গোবরিয়া, পঞ্চকোটি, মোলা, ধুলিয়া, মালয়া, জেঠিয়া, খাটুরিয়া, পাথুরিয়া।" [৮৪]

সদগোপ্ ঃ- সচ্চাষী, আদিনাম গোপ। গোভূম আদি নিবাস। পদবী এদের মন্ডল। এরা দুটি ভাগে বিভক্ত ঃ পশ্চিমকুলিয়া এবং পূর্বকুলিয়া। পেশা- গোপালন ও চাষবাস করা।

যদুপতিয়া ঃ- হিন্দু ও মুসলমানের মাঝামাঝি। আল্লার উপাসনা আবার কালীর উপাসনা দুই-ই করে। অনেকের হিন্দুয়ানি নাম অথচ মৃতদেহ কবর দেয়। বিবাহে পৌরোহিত্য করেন কাজী। বিয়ের পর মেয়েরা মাথায় সিঁদুর দেয়। বর্তমানে কেউ পিতলের জিনিস, বাজীকর, কেউ পটের ছবি, আবার কেউ ফকিরী গিরি করে।

চামার ঃ- চর্মকার। চামড়ার কাজ করে। তাঁতী সম্প্রদায়ের মধ্যেও চামার দেখা যায়।

রাজবংশী ঃ- কোচ, রাজোয়ার, তিয়োর ইত্যাদি নামে পরিচিত। চাষবাস করে।

লোহার ঃ- এই সম্প্রদায় " কনৌজিয়া, কোকা, মাঘইয়া, কামারকল্লা, মাহুলিয়া নামে পরিচিত। আবার অঞ্চলভিত্তিক নামও পাওয়া যায়। যেমন বীরভূমিয়া, গোবিন্দপুরিয়া, শেরঘরিয়া ইত্যাদি। লোহার কাজ, কাঠের কাজ করে। কিছু অঞ্চলে তারা চাষবাষ করে"। [৮৫]

কোরা ঃ- " উপবিভাগ চারটি, ধোলো, মোলো, শিখরিয়া, বাদামিয়া। বাঁকুড়ায় এরা সোনারেখা, জেঠিয়া, গুড়িবাওয়া ইত্যাদি নামে পরিচিত"। [৮৬]

মুচি ঃ- " বড়ভাগিয়া, ছোটভাগিয়া— যথাক্রমে চাষবাস ও চামড়ার কাজ ও বাজনা বাজায়। উপবিভাগ গুলি হ'ল চাষাকুরুর বা চাষা-কোনাই— চাষবাস করে। বেতুয়া—বেতের কাজ করে। মুচি বা কোরা—কাপড় তৈরী করে। টিকাকার কোনাই— টিকে তৈরী করে যা জ্বালানীর কাজে বিশেষ হুকো পানের জন্যে জ্বালানীর কাজে লাগে "। [৮৭]

মাল ঃ- " মল্ল, মালা, মাল প্রধান বিভাগ। উপবিভাগগুলি হ'ল— ধইয়া, গোবরা, ঘেরা, রাজবংশী, সনাগন্দ। বীরভূমে এরা খাটুরিয়া, মল্লিক, রাজবংশী নামে পরিচিত। বর্তমানে চাষবাস করে "। [৮৮]

সাঁওতাল ঃ- দ্রাবিড় বংশোদ্ভূত। বীরভূম জেলার পাশেই সাঁওতালপরগণা যেখানে সাঁওতালদের বসতি। কালক্রমে এরা বীরভূমে এসে বসবাস করতে থাকে। কর্মঠ, স্বাস্থ্যবান, পরিশ্রমী, সাহসী, সহজাত সারল্যে ভরপুর। এদের অনেকগুলি শাখা আছে। যেমন-মাঝি, মুর্মু, কিসকু, সোরেণ, টুডু, মার্ডি বেসরা, হেমব্রম, হাঁসদা, বাস্কে, ওঁরাও, পাত্তরিয়া, চোরে, বেদিয়া ইত্যাদি। দেবতা শিঙে বোঙা (সূর্য), মারাংবুরু (পর্বত), জাহের এরা (শিবদুর্গা) প্রভৃতি। **উৎসব** এদের আনন্দের প্রধান অঙ্গ। বাঁদনা, ধরম, এখান, বাহা, সিমজন, দাঁসাই সেহরাই, নাইকি, নাউবাই, তীরবেঁধা— ইত্যাদি হল এদের পরব।[৮৯] " সাঁওতাল পরগণার সাঁওতালী সংস্কৃতি অর্থাৎ আদি অস্ট্রিক বা নিষাদ সংস্কৃতির ধারা যেন উত্থান পতনের বন্ধুর পথে প্রবাহিত হয়ে বাংলার সুসমন্বিত সংস্কৃতি-গঙ্গায় মিলিত হয়েছে।" [৯০]

মুসলমান ঃ- মুসলমানদের শাখা অনেক। তন্মধ্যে ঠাকুরযোগী বংশের সন্তান ও আগে মুসলমানদের ধর্মগুরু ছিলেন। পাঠান, সৈয়দ, জোলা, শেখ-ইত্যাদি। পূর্বে অনেকেই ভূস্বামী ছিল, বর্তমানে অনেকেই কৃষক শ্রেণীভুক্ত। সত্যপীর বা সত্যনারায়ণ হিন্দু ও মুসলমানদের সমন্বয়কারী দেবতা। দেবতার উৎসর্গীকৃত প্রসাদকে উভয় সম্প্রদায়ই সিন্নী বলে থাকে।

এইসব অবহেলিত, শোষিত, অশিক্ষিত শ্রেণীকে বর্তমানে শিক্ষার আলোয় নিয়ে প্রসার বিভিন্ন কর্মসূচী গ্রহণ করেছেন দেশের সরকার বাহাদুর। কেউ কেউ উচ্চশিক্ষা লাভ করেছে। বর্তমান রাজনৈতিক জগতে প্রবেশ করে নিজেদের মর্যাদা প্রতিষ্ঠায় বদ্ধপরিকর। অনেকেই সাম্যবাদী চেতনা লব্ধ হয়েছে, নিজেদের আভিজাত্য বা সম্ভ্রম সম্পর্কে ওয়াকিবহাল হয়েছে; গ্রাম্য পঞ্চায়েত এ সক্রিয়ভাবে প্রবেশাধিকার লাভ করেছে; বিভিন্ন সরকারী অনুদান ও সাহায্য লাভ করে এবং সরকারী খাস জমি প্রাপ্ত হয়ে এই সম্প্রদায় বর্তমানে সভ্য জগতে আসতে আরম্ভ করেছে। এদের সামান্য অংশে জন্ম নিয়ন্ত্রণ চেতনা বেড়েছে। মদের নেশাও কমেছে। অবশ্য এক শ্রেণীর সাঁওতালদের মধ্যে গোষ্ঠী চেতনা প্রকট ও সক্রিয়।

ঘ. কৃষক আন্দোলন—তেভাগা আন্দোলন

অতি প্রাচীন কাল থেকেই রাজা ও প্রজা বা শাসক ও শাসিতের সম্পর্ক বিদ্যমান। ইউরোপীয় সভ্যতায় খ্রীষ্টীয় তৃতীয় শতক থেকেই কৃষকশ্রেণীর উল্লেখ পাওয়া যায় যদিও তাদের নিজস্ব জমি ছিল না। বেগার (সার্ফ) খাটাই ছিল ভাগ্যলিপি। মধ্যযুগে 'ম্যানর' প্রথার উদ্ভব ঘটে। এই ব্যবস্থাতেও কৃষকরাই শোষিত হয়। কৃষকদের সঙ্গে ম্যানর মালিকদের কোন যোগ ছিল না। কিন্তু ভারতের কয়েকটি ক্ষেত্রে কৃষকরা জমির মালিকের অধীন ছিল। তখন অধিকাংশ ক্ষেত্রে জমির মালিক ছিল ব্রাহ্মণ। তাঁদের জমিতে চাষীরা নির্দিষ্ট শ্রমের বা ফসলের পরিবর্তে চাষ করত। ফলে জমির মালিক চাষীদের বদলাতে পারতেন অর্থাৎ প্রজাদের উৎখাত করতে পারতেন। কোন কোন ক্ষেত্রে কৃষকদের বেগার খাটতে হত। মধ্য ভারতে গুপ্তযুগীয় দানপত্রে দেখা যায় যে কৃষকদের বেগার খাটতে হত। মার্ক ব্ল্যাক বলেছেন, "এই বাধ্যতামূলক শ্রমদান ইউরোপীয় সামন্ততান্ত্রিক প্রথাকে স্মরণ করায়। যেখানে প্রধানত দুপ্রকারের দায়িত্ব প্রজাদের পালন করতে হত (১) কর দেওয়া (২) মালিকদের খাস জমিতে বেগার খাটা"। [৯১] সুতরাং এই সময়ে কি ইউরোপে কি ভারতে-সর্বক্ষেত্রে কৃষকরা ছিল দাসের পর্যায়ে। জমির মালিক পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে ঐ অঞ্চলের চাষীরাও নতুন মালিকের অধীনস্থ হয়ে যেত। মধ্যযুগে কৃষকদের অবনতির মূল কারণ প্রসঙ্গে শ্রীরামশরণ শর্মা বলেছেন, " মধ্যযুগে কৃষকদের অবনতি ঘটে। এর মূল কারণ ছিল (১) করভার বৃদ্ধি (২) বেগার প্রথা (৩) দানলব্ধ জমি পুনরায় দান"। [৯২]

খ্রীষ্টীয় দ্বাদশ থেকে অষ্টাদশ শতক পর্যন্ত কৃষির বৈশিষ্ট্য হিসেবে বলা যেতে পারে যে সুলতান ফিরোজশাহ তুঘলক, শেরশাহ ও আকবরের কৃষির উন্নতির জন্যে সদিচ্ছা ছিল। তখন অনেক গ্রামই স্বয়ং সম্পূর্ণ হয়ে পড়ে, গ্রামগুলো রাতারাতি উৎপাদনের কেন্দ্র হয়ে দাঁড়ালো। মোগল সাম্রাজ্য এইসব স্বয়ং সম্পূর্ণ গ্রাম-গঞ্জ থেকে রাজস্ব সংগ্রহ করে অর্থে ও প্রতিপত্তিতে শ্রেষ্ঠ হয়ে দাঁড়ায়। মুঘল সম্রাট ঔরঙ্গজেবের পরে মুঘল সাম্রাজ্যের ভাঙন শুরু হয়। প্রশাসনিক রক্ষানাবেক্ষনের দুর্বলতার সুযোগে গ্রামশাসক ও কর-আদায়কারীগণ অত্যাচারী হয়ে ওঠে। "গ্রাম সমাজে কর আদায়কারী প্রধান ব্যক্তিগণ ব্যাপক ক্ষমতার বলে ক্রমশঃ উৎপীড়কের ভূমিকায় অবতীর্ণ হইতে থাকে।" [৯৩] এই কর আদায়কারী শ্রেণীই পরে গোমস্তায় পরিণত হয়। সুবাদার, জমিদার, গোমস্তা ও অন্যান্য কর্মচারী কর্তৃক গ্রামে চলতে থাকে অবাধ লুণ্ঠন ও উৎপীড়ন।

ফসলের মাধ্যমে রাজস্বদান প্রথাও কৃষকদের দুর্দশার অন্যতম কারণ। নিরক্ষর, সরল চাষীদের কাছে থেকে ঠকিয়ে অনেক বেশী ফসল আদায় করতেন।

এরপর এল বৃটিশ সরকার। তাঁরা মুদ্রার প্রচলন করে রাজস্ব মুদ্রায় নিতে থাকেন। কারণ তাঁদের একমাত্র উদ্দেশ্য এ দেশ থেকে অর্থ আদায় করে স্বদেশে নিয়ে যাওয়া। কাঁচামাল হিসেবে তাঁরা তুলাজাতীয় ফসল আদায় করতেন বা নগদ অর্থে ক্রয় করতেন। দেশীয় অধস্তন কর্মচারীরা রাজস্ব যাতে আত্মসাৎ করতে না পারে তার জন্যেও ইংরেজরা নগদ অর্থে রাজস্ব আদায়ের ব্যবস্থা করেছিলেন। চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের ফলে এদেশে জমি ব্যক্তিগত মালিকানা লাভ করে এবং বংশানুক্রমিক জমিদারী ব্যবস্থার সূচনা হয়। এই চিরস্থায়ী অথচ অভিজ্ঞতাহীন নব্য অযোগ্য জমিদারের কুচক্রে প্রচলিত গ্রামীণ সমাজ অর্থনীতি ও স্বয়ং নির্ভর কাঠামোকে ভেঙে দিতে শুরু করে। গ্রাম সমাজের ও জীবনের যাবতীয় কর্তৃত্বভার জমিদারীর কাছারীতে প্রবেশ করে। বৎসরান্তে খাজনা প্রদান করা ঠিক হল। ফসল কম উৎপাদিত হলে রাজস্ব প্রদানে অপারগ হলে কৃষকগণ জমি বিক্রয় বা বেশী সুদে জমি বন্ধক দিতে বাধ্য হয়। সেই সূত্রেই গ্রামীণ সমাজে আবির্ভাব ঘটল বিত্তবান মহাজনশ্রেণীর। যারা কালক্রমে কৃষকের পরিত্রাতার ভূমিকা নিয়ে কৃষকদের নিঃস্ব করে জমি-জমা সব গ্রাস করে। **" Though the classes of money lenders and merchants existed in the rural area of pre-British India, their function and position in old economy, were substantially different from those in the new economy. The money Lender in the old Indian society played almost an insignificant role. He occasionally lent money to the village agriculturist or artisan, the interest strictly fixed by the village panchayet. Further the money lender could not annex the land or live stock in case a farmer did not meet the interest claim since the land belonged**

to the village community." [৯৪] জমিদার নির্দিষ্ট পরিমাণ রাজস্ব বৃটিশ সরকারের হাতে তুলে দিয়ে নিশ্চিন্তে ভোগ বিলাসের জন্যে কৃষকদের কাছ থেকে নানাভাবে সর্বদা অর্থ আদায় করতে থাকেন। এইভাবে ইংরেজ সরকার, জমিদার ও মহাজন বা উপস্বত্ব ভোগীদের শোষণে ও শাসনে বাংলার কৃষককুল নিশ্চিত মৃত্যুর দিকে অগ্রসর হয়। "বঙ্গদেশের হতভাগ্য কৃষক ইংরেজ শাসন, জমিদার গোষ্ঠী ও মধ্যশ্রেণী— এই তিনটি শোষণ শ্রেণী লইয়া গঠিত বিশাল সামাজিক পিরামিড পৃষ্ঠে বহন করিয়া আসিয়াছে। বঙ্গদেশের কৃষকের সংগ্রাম এই শোষণের পিরামিডকে উহার পৃষ্ঠ হইতে অপসারণের, উহার কবল হইতে মুক্তিলাভের সংগ্রাম।" [৯৫]

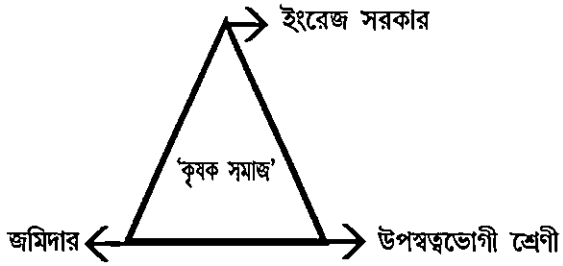

ইংরেজ কোম্পানী এদেশে কাঁটা দিয়ে কাঁটা তোলার নীতি গ্রহণ করে অর্থাৎ রাজস্ব আদায়ের জন্যে বাংলা বিহারের দায়িত্ব দেয় এখানকার নিষ্ঠুরঅ দুই দস্যু-সর্দার রেজা খাঁ ও সিতাব রায়কে। তারা 'নাজিম' নামে পরিচিতি লাভ করে। এদের অত্যাচারে জমিদার ও কৃষকদের নাভিশ্বাস ওঠে। ১৭৬৪-৬৫ খ্রীষ্টাব্দে যখন রাজস্ব আদায় হয়েছিল ১ কোটি ২৩ লক্ষ টাকা তখন পরের বছর ১৭৬৫-৬৬ খ্রীষ্টাব্দে নাজিমগণ রাজস্ব আদায় করে ২কোটি ২৩ লক্ষ টাকা। এ ছাড়া মুনাফার লোভে কোম্পানীর লোকেরা এদেশে শস্যকে ক্রয় করে ও গুদামজাত করে। পরে দাম চড়া হলে তা বাজারে বিক্রি করে। সেই সঙ্গে অনাবৃষ্টি ঘটে। যার বিষময় ফল "ছিয়াত্তরের মন্বন্তর"। তৎকালীন প্রশাসকগণ এই দুর্ভিক্ষকে দৈব দুর্ঘটনা বলে অভিহিত করতে থাকে। বাংলা বিহারের প্রায় দেড়কোটি কৃষক ইংরেজ কোম্পানীর সর্বগ্রাসী ক্ষুধার আগুনে প্রাণ আহুতি দেয়। হান্টার সাহেব দুর্ভিক্ষের সময় এদেশের বুভুক্ষু জনতার করুণ দৃশ্য অঙ্কন করে বলেছেন, "অনাহারক্লিষ্ট ও নিরাশ্রয় জনতা খাদ্যের সন্ধানে মরিয়া হইয়া জনমানবহীন গ্রামগুলিতে হানাদিয়ে ফিরিত। ক্ষুধার জ্বালায় উন্মত্ত হইয়া জীবন্ত মানুষের মৃতদেহ ও মুমূর্ষু মানুষের দেহ দাঁত দিয়া কামড়াইয়া খাইত।" [৯৬] দুর্ভিক্ষের জন্যে শুধু ইংরেজরাই দায়ী ছিল না, দেশীয় অর্থ পিপাসু হৃদয়হীন জহ্লাদরূপী নরখাদকরাও দায়ী। এ প্রসঙ্গে 'ইয়ং হাজব্যান্ড' এর উদ্ধৃতিটি প্রণিধানযোগ্য। "এই হতভাগ্য দেশে দুর্ভিক্ষ কোন অজ্ঞাতপূর্ব ঘটনা নহে। কিন্তু দেশীয় জনশত্রুদের সহযোগিতায় একচেটিয়া শোষণের বর্বর সুলভ মনোবৃত্তির অনিবার্য পরিণতি স্বরূপ যে অভূতপূর্ব বিভীষিকাময় দৃশ্য দেখা দিল, তাহা এমনকি ভারতবাসীরাও আর কখনও দেখে নাই বা শুনে নাই।" [৯৭] চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের ফলে নিত্য নতুন অনভিজ্ঞ জমিদারের আবির্ভাব ঘটে, যারা অবাধ লুণ্ঠনের মাধ্যমে কৃষকদের চিরকালের জন্যে উচ্ছেদ করে সর্বহারা শ্রেণীতে পরিণত করে।

"এই বন্দোবস্তের প্রথম বৎসরেই জমিদার গোষ্ঠী কৃষকদের নিকট হইতে প্রায় তিনগুন খাজনা ও কর আদায় করে" [৯৮] এইভাবে জমিদার ও মহাজনশ্রেণী স্থায়ীভাবে শোষকের ভূমিকায় অবতীর্ণ হলেন। ছলে-বলে কৌশলে ঋণদানের জালে আবদ্ধ করে তাদের ঘরবাড়ি কেড়ে নিয়ে ভূমিহীন, গৃহহীন করে দেন। বাংলাদেশের সাবলীল সমাজব্যবস্থা অর্থনৈতিক স্বাচ্ছন্দ্য প্রায় অধঃপতনের সম্মুখীন হয়। "চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত বঙ্গদেশের অধঃপাতের চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত মাত্র, কস্মিনকালে ফিরিবে না। ইংরেজ-দিগের এ কলঙ্ক চিরস্থায়ী কেননা এই বন্দোবস্ত চিরস্থায়ী।" [৯৯]

শিল্পবিপ্লব প্রসূত কিছু ব্যবসায়ী বুর্জোয়া শ্রেণীর কেন্দ্রে পরিণত হয় এই বাংলাদেশ। এদেশ থেকে কাঁচামাল অল্পদামে ক্রয়ে করে ম্যাঞ্চেষ্টার থেকে বস্ত্র সামগ্রী তৈরী করে তারা এদেশে উচ্চমূল্যে বিক্রি করে। ফলে এদেশের চিরকালীন ঐতিহ্য স্বরূপ কুটীর শিল্পের ধ্বংস হয়, বেকারত্বের সম্মুখীন হয় অসংখ্য কারিগর শ্রেণী, যাদের ভবিষ্যৎ কেবল গাঢ় অন্ধকারে নিমজ্জিত হয়। উপরন্তু "তখন বস্ত্র ব্যবসায়ী ইংরেজ বণিকেরা তাহাদের নিকট বাজার দরের অর্ধেক মূল্যে মসলিন ও কেলিকো বিক্রয় করিবার চুক্তিপত্রে স্বাক্ষর করিতে ভারতীয় তাঁতীদের বাধ্য করিত। তাঁতীরা চুক্তিপত্রে স্বাক্ষর করিতে অসম্মত হইলে অমানুষিক দৈহিক পীড়নের দ্বারা স্বাক্ষর আদায় করা হইত।" [১০০] ফলে এদেশে কুটীর শিল্প বিশেষ করে তন্তুবায় ধ্বংস হয়ে গেল। "ব্যবসা বাণিজ্যের ইতিহাসে এই প্রকার দুর্দশার কোন তুলনা নাই। তন্তুবায়গণের অস্থিতে ভারতের মাটি সাদা হইয়া গিয়াছে।" [১০১] এইসব কারিগর শেষ পর্যন্ত কর্মহীন হয়ে কৃষকে পরিণত হয়। "শিল্প প্রধান বঙ্গদেশ ইহার প্রধান শিল্পটি হারাইয়া কেবলমাত্র কৃষিনির্ভর দেশে পরিণত হয়।" [১০২] বৃত্তি হারিয়ে অজস্র শ্রমিক, কারিগর কৃষিতে ভিড় করে। "এখন হইতে কৃষক তন্তুবায়গণকে সম্পূর্ণরূপে নির্ভর করিতে হইল কেবল কৃষির উপর এবং ইহার ফলে জমিদার শ্রেণীর সহিত সম্পর্কের ক্ষেত্রে

চাষীর অবস্থা আরও শোচনীয় হইয়া উঠিল।" [১০৩] এইভাবে ইংরেজ শাসনে ও শোষণে সর্বস্বান্ত, শোষণ ও পীড়ণে বন্দী, কৃষক ও কারিগরের উষ্ণরক্তে রঞ্জিত হল ভারতবর্ষ। বাংলার ঐতিহ্যবাহী ছন্দ ও সুরের পতন ঘটল। এইভাবে ধ্বংসলীলা চলতে থাকে, প্রায় শতাব্দীকাল ধরে, ধীরে ধীরে কৃষকদের মানসিকতার পরিবর্তন ঘটে। সিপাহী বিদ্রোহে তাই কৃষকদের ভূমিকা ছিল গুরুত্বপূর্ণ। ১৮৮০ খ্রী: মধ্যবর্তী সময়ে করভারে জর্জরিত, পুঁজিহীন সর্বস্বান্ত কৃষক অনাহারে, অর্ধাহারে, ম্যালেরিয়া, মহামারীর শিকার হয়। এই সময়ে বাংলাদেশের ছোট-লাট চার্লস ইলিয়ট বলেছিলেন, "আমি মুহূর্ত মাত্র ইতস্ততঃ না করিয়া বলিতে পারি, বৃটিশ ভারতের কৃষিজীবী প্রজার অর্ধাংশ সারা বৎসরের মধ্যে একদিনও পেট ভরিয়া খাইতে পায় না। ক্ষুধার সম্পূর্ণ নিবৃত্তিতে যে কি সুখ, তাহা ইহারা কখনও জানিতে পারে না।" [১০৪] বৃটিশ শাসনের অন্যতম প্রধান অবদান হল এদেশে চিরস্থায়ী দুর্ভিক্ষের সৃষ্টি। পূর্বে গ্রাম সমাজকে প্রাকৃতিক দৈব দুর্বিপাক থেকে রক্ষার জন্য গ্রামে গ্রামে ধর্মশালা থাকত যেখানে শস্য জমা থাকত। "বৃটিশ শাসনের পূর্বে গ্রাম সমাজের নিয়ন্ত্রণাধীনে বিশেষ অবস্থার জন্যে প্রত্যেক গ্রামে একটি করিয়া শস্যভান্ডার থাকিত এবং তাহা দ্বারা দুর্ভিক্ষের সময় গ্রামবাসীদের জীবন রক্ষা পাইত।" [১০৫]

ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভে বঙ্গদেশে ছিল ইংরেজ কৃপাপুষ্ট ভূস্বামীগোষ্ঠী ও অন্যদিকে কৃষিকাজে নিযুক্ত কৃষক সম্প্রদায়। পরে রেনেসাঁসের দৌলতে এদেশে মধ্যশ্রেণীর আবির্ভাব হয়, যারা জমিদারের সহকারী—এরা কেউ শহরবাসী, আবার কেউ গ্রামবাসী। বিদেশী শাসকদের প্রতি ছিল মোহাচ্ছন্ন ও আস্থাবান। বিংশ শতকে মহাযুদ্ধোত্তর পৃথিবীতে বেকারত্ব, মূল্যবৃদ্ধি, মনুষত্বহীনতা বৃদ্ধি পেতে থাকে এবং মধ্যবিত্ত শ্রেণীর একাংশ বৃটিশ শাসনের বিরুদ্ধে ক্ষোভ প্রকাশ করতে থাকে।

১৯৩০ সালে চরম কৃষিসঙ্কট দেখা দেয়। কৃষকগণ ধীরে ধীরে উপলব্ধি করতে সক্ষম হয় যে তাদের পাশে কেউ নেই; তাদের নিজেদের অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখতে হলে ঐক্যবদ্ধ হতে হবে। চারদিকে অন্নাভাব, অর্থাভাব হাহাকার দেখা দিলেও কেউ তাদের পাশে এসে দাঁড়ায়নি। তারাশঙ্কর এই কৃষকদের দুর্দশা ও দুর্ভিক্ষের বর্ণনা এমন দিয়েছেন যা যে কোন সুস্থ মানুষের চিত্তে চকিতে ভয়, দুঃখ, ক্রোধ ইত্যাদি সঞ্চারীভাবের সৃষ্টি হয়। অনেক ঐতিহাসিক বা লেখক কৃষকদের বর্ণনা দিতে গিয়ে বহু তথ্য ও প্রমাণের সাহায্য নিয়েছেন অথচ বিনা তথ্যেই তারাশঙ্করের বর্ণনা অনেক বেশী হৃদয়গ্রাহী ও বাস্তব বলে মনে হয়েছে। " সমস্ত গাঁ-টা যেন আবছা ধোঁয়াতে ছেয়ে গিয়েছে, নদীর বুকে, বাতাসে তপ্ত বালি হুহু করছে, নদীর ওপরেই শ্মশানের ছাই উড়ছে, শেয়াল, কুকুর, শকুনি চেঁচাচ্ছে, গাঁয়ের মাঝথেকে একটা সাড়া নাই কারু যেন সব মরে গিয়েছে,.....। (চৈতালী ঘূর্ণি)"

বিংশ শতাব্দীতে শিক্ষা বিজ্ঞান প্রযুক্তির উন্নতি ঘটেছে, অথচ কৃষকদের উন্নতির দিকে কেউ কর্ণপাত করেনি, সমাজের যেন তারা বোঝা। "কৃষক হইল বহুস্তরে বিভক্ত ব্যক্তিগত সম্পত্তির বন্ধনে আবদ্ধ, ক্ষুদ্র শোষক শোষিতের লইয়া গঠিত এবং মধ্যশ্রেণীর নিম্নস্তরের অবস্থিত একটি সম্প্রদায় মাত্র। [১০৬] ইংরেজ জমিদার, মহাজন, মধ্যস্বত্বভোগীদের নগ্নশোষণে মৃত্যু পথযাত্রী কৃষকের দল পাল্টা আঘাতও হেনেছে, যদিও তারা অর্থ, বুদ্ধি, ঐক্য ও অস্ত্রশস্ত্রের অভাবে বিফল হয়েছে—সন্ন্যাসী বিদ্রোহ দিয়ে যার শুরু হয়। "বঙ্গদেশে বৃটিশ রাজত্ব কালে নীল বিদ্রোহই প্রথম বিপ্লব।" [১০৭] ওয়াহাবী, ফরাজী, সাঁওতাল, কোল, মুন্ডা প্রভৃতি কৃষক বিদ্রোহ দিয়ে যার শুরু হয়, তা ক্রমশঃ দারিদ্র্যের চাপ থেকে বাঁচতে অনন্যোপায় হয়ে কৃষকেরা ডাকাতিতে অভ্যস্থ হয়ে পড়ে।

ভারতে কৃষক বিদ্রোহ প্রথমে শুরু হলেও স্থায়ী আন্দোলন শুরু করে শ্রমিকগণ; শ্রমিকদের ঐক্য ও উৎসাহে গ্রামের কৃষকরাও যৌথভাবে আন্দোলনে সামিল হয়। তাছাড়া শ্রমিকগণ তো গ্রামের সর্বহারা কৃষকদেরই সহধর্মী। স্বদেশী ও বয়কট আন্দোলনের ফলে এদেশে বহু কারখানা স্থাপিত হয়, এবং শ্রমিকের সংখ্যা আশাতীতভাবে বৃদ্ধি পায়। শোষণ ও উৎপীড়নের জন্যে শ্রমিকগণ বুর্জোয়া ও বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদী শক্তির বিরুদ্ধে আন্দোলন শুরু করে। ১৯২০ সালে "ট্রেড ইউনিয়ন" প্রতিষ্ঠা হলে তাদের সাফল্যে উৎসাহিত হয়ে দেশীয় রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ ১৯৩৬ সালে "নিখিল ভারত কৃষকসভা" প্রতিষ্ঠা করেন।

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের অবসানে শ্রমিক সংগ্রামের সঙ্গে সমগ্র বঙ্গদেশে তেভাগার দাবিতে প্রায় ৫০লক্ষ ভাগচাষীর ঐতিহাসিক সংগ্রাম শুরু হয়। " ভারতের শ্রমিক সংগ্রাম ও কৃষক সংগ্রাম পরস্পরের সহিত সংযুক্ত এবং একটি বৈপ্লবিক সংগ্রামের দুই অচ্ছেদ্য অংশ। ইহা ভারতের বৈপ্লবিক সংগ্রামের এক বিশেষ উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য।" [১০৮] জমিদার, জোতদার, নিজেদের জমি কৃষকদের মধ্যে ভাগচাষের জন্যে দিত। কৃষকগণ রোদেপুড়ে, জলে ভিজে ফসল ফলিয়ে তার অর্ধেক মালিকদের দিত। এদিকে জমির চাষের খরচ ও বাবদ খরচ সুদসহ মহাজনদের মিটিয়ে চাষীর হাতে ফসলের প্রায় কিছুই অবশিষ্ট থাকত না। তাই আধিদারগণ 'তেভাগা' আন্দোলনে মেতে ওঠে। মোট উৎপাদিত ফসলের চাষীরা তিনভাগের দু'ভাগ দাবী করে। মালিকপক্ষ পাবে একভাগ। অবশ্য যদি জোতদারগণ চাষের যাবতীয় খরচ বহন করে

তাহলে সেখানে ফসলের অর্ধেক পাবেন। জোতদারের হাতে তখন ২/৪ হাজার বিঘা জমি ছিল। "তখনকার দিনের এক পরিসংখ্যানে পাওয়া যায় তৎকালীন যুক্তবাংলার শতকরা ৬৪ ভাগ জমি ছিল দেশের শতকরা ১৪জনের হাতে। .....বহু জোতদারের ৫/৬ হাজার বিঘা পর্যন্ত জমি ছিল। এক হাজার দুহাজার বিঘা জমির মালিক ২/৪ জন প্রায় প্রতি গ্রামেই ছিল। ভূমিহীন গরীব কৃষকদের সংখ্যা শতকরা ৭০ ভাগ ছিল।" (১০৯)

জোতদারগণ কোনরূপ কায়িক পরিশ্রম করত না, উৎপাদনের জন্যে কোনরূপ ক্যাপিটাল বিনিয়োগ করতেন না, উপরন্তু তাঁরা মহাজনী কারবার করতেন; অর্থাৎ অভাবের তাড়নায় ভাগচাষীরা তাঁদের দ্বারস্থ হলে, জোতদারগণ তাদের ধান কর্জা দিতেন। কর্জা ধানের সুদ 'দুন' অর্থাৎ একমন ধান ধার নিলে শোধ করার সময় চাষীকে দু'মন ধান দিতে হত। উৎপাদনের জন্যে যাবতীয় ঝুঁকি আধিয়ারদের নিতে হত । ফসল উঠলে তা বয়ে এনে জোতদারদের খামারে আনতে হত। সেখানে মাড়াই, ঝাড়াই করে শস্য মালিকের গোলায় ভরে দিতে হত চাষীদের। কোন কোন জোতদার উৎপন্ন ফসলের ২/৩ অংশ নিজে নিতেন। ফলে সব খরচ ও কর্জা মিটিয়ে আধিয়ার যা ফসল পেত তা বছরের ২/৩ মাসেই খরচ হয়ে যেত। এছাড়া জোতদারদের বাড়ীতে বিভিন্ন উৎসব-অনুষ্ঠানে ও অন্যান্য কাজের জন্যে আধিয়ারদের বেগার খাটতে হত। অবাধ্য হলে তাদের উপর চলত জুলুম ও অত্যাচার। ফলে জোতদার ও মহাজনদের এই জঘন্য প্রথার বিরুদ্ধে কৃষকদের তীব্র বিক্ষোভের সৃষ্টি হয়। এই সময় বিভিন্ন দেশের কৃষকরা জোটবদ্ধ হয়ে সংগ্রামের মাধ্যমে নিজেদের দাবী আদায় করে নিতে শুরু করেছে। এর প্রভাবও এদেশের কৃষকদের হৃদয়কে স্পর্শ করে। শুরু হয় "তে-ভাগা আন্দোলন"। অর্থাৎ উৎপন্ন ফসলের মোট তিনভাগের দুভাগ চাষীর এবং একভাগ জোতদারের।

তারাশঙ্করের গল্পে বা উপন্যাসে তে-ভাগা আন্দোলনের প্রেক্ষাপট খুব একটা বেশী নেই। কারণ হয়ত তে-ভাগা আন্দোলনের মূলকেন্দ্র ছিল উত্তরবঙ্গ এবং দক্ষিণবঙ্গ, পূর্বাঞ্চল। রাঢ় বাংলার বেশীর ভাগ চাষীদেরই জমি ও ঘরে লাঙ্গল ছিল। তাই ভাগচাষী অনেক কম ছিল। তাছাড়া দক্ষিণবঙ্গের রাঢ় অঞ্চলে কারখানার ব্যাপক প্রচলনও খনির প্রাচুর্য হেতু ভূমিহীন কৃষক শ্রমিকের কাছে ব্যাপৃত হয়েছিল। বর্তমানেও রাঢ়ের চিত্র পূর্ববৎ। কেবলমাত্র সেইসব পরিবারের জমি আধিয়ারের কাছে থাকে যারা বিভিন্ন কর্ম হেতু গ্রামের বাইরে থাকেন। বর্তমানে অনেকে চাকরী করেও বাড়ীতেই চাষের দায়িত্ব রাখেন। দ্বিতীয়তঃ এখানে জমির ব্যক্তিগত মালিকানার পরিমাণ খুব একটা বেশী ছিল না। তাই তেভাগা আন্দোলনের প্রত্যক্ষ প্রভাব থেকে রাঢ় প্রায় মুক্ত ছিল। যেহেতু তারাশঙ্করের সাহিত্যের বিচরণভূমির অধিকাংশ ক্ষেত্রই হল রাঢ় অঞ্চল তাই তাঁর লেখাতেও তেভাগা প্রত্যক্ষ প্রভাব প্রকট নয়।

জমিদার সন্তান হয়েও তারাশঙ্কর ছিলেন খেটে খাওয়া মেহনতি কৃষকদের পক্ষে। তারাশঙ্কর বিশ্বাস করতেন, "লাঙ্গল যার জমি তার" হওয়াই উচিত। কিন্তু বিপ্লববাদে কোন দিনই বিশ্বাসী ছিলেন না। তে-ভাগা আন্দোলনের প্রেক্ষাপটে লেখকের গল্প "বরমলাগের মাঠ"।

বরমলাগের মাঠ ঃ-" চাষী কৃষাণদের মধ্যে ঢেউ উঠেছে তে-ভাগা। এতদিন মনিবে পেয়েছে দু'ভাগ, এবার তারা দাবি করছে দু'ভাগ।" রাজনৈতিক বিশেষ করে সমাজতন্ত্রবাদে বিশ্বাসী হয়েও লাভের লোভে বা কৌতূহলের বশে অল্পদামে সম্পত্তি নীলামে ক্রয় করেন শিবনাথ। বলরাম নিরীহ চাষী। বংশপরম্পরায় তারা বরমলাগের মাঠ চাষ করে আসছে। কোনদিনই তারা মনিবের প্রতি কর্তব্য পালনে ত্রুটি করেনি। শিবনাথকেও সমাদরে প্রভুত্বের আসনে বসিয়ে সেবার্ঘ্য দিয়েছে। শিবনাথ ও বলরামকে অত্যন্ত ভালবাসেন। শিবনাথ বলরামকে তেভাগা আন্দোলনে সামিল হতে নিষেধ করেছেন। এমন কি শিবনাথ বলরামকে নায্য পাওনা দিতেও স্বীকৃত হয়েছেন। "দুভাগ যদি দেশ চলিত পাওনা হয় বলরাম, আমি তাই দোব তোমাকে। তাতে আমিও আপত্তি করব না। যদি নাও হয়, তবু ভাগ এবার তোমার বাড়িয়ে দোব, দোব নয়, দিলাম। আঠারো-বাইশ ভাগের তোমার বাইশ আমার আঠারো।" কিন্তু এখানে একটা প্রশ্ন থেকে যায় তা হ'ল শিবনাথ একান্ত উদার মানসিকতার লোক নন। কারণ ২২ ও ১৮ ভাগ তো কম, তিনি তো প্রকারান্তরে বলরামকে ঠকাতে চেয়েছেন। তে-ভাগ তো হল না। তাই হয়ত বলরাম অনিচ্ছা সত্ত্বেও বিপ্লবী কৃষক আন্দোলন থেকে নিজেকে সরিয়ে নিতে পারেনি। তাই স্বার্থান্বেষী শিবনাথ বলরামকে গুলি করেছেন। বলরামের প্রতি শিবনাথের আচরণ মানবোচিত হয় নি। তা সত্ত্বেও " কিন্তু গল্প রস সৃষ্টিতে "বরমলাগের মাঠ" তারাশঙ্করের উত্তরজীবনের অন্যতম শ্রেষ্ঠ রচনা।" (১১০)

শিবনাথ সমাজতন্ত্রের বুলি আওড়ালেও তার বিপক্ষে ছিলেন বলে মনে হয়। কারণ তিনিও চার্চিলের "The brute fact is that, socialism means mismanagement, bad house keeping in competence and progressive degeneration"--এই বক্তব্যকে সমর্থন করেছেন। এই জন্যেই বোধ হয় সঠিক ভাগ দিতে নারাজ হয়েই বলরামকে হত্যা করেছিলেন। "তারাশঙ্করই প্রথম কথাশিল্পী, যিনি কৃষাণের জীবনের শরিক হয়ে, কর্মে ও কথায় তাদের সঙ্গে সত্য আত্মীয়তা অর্জন করে, বাংলা সাহিত্যকে অবজ্ঞাত পল্লীর অনভিজাত মানবসমাজে ছড়িয়ে দিলেন। সমাজের অন্তেবাসী ব্রাত্য ও গোত্রহীন মানুষের দল সরস্বতীর আঙিনায় প্রবেশাধিকার পেল, বিপুলায়তন জনপদের লক্ষ মানুষের কলধ্বনি শোনা গেল সাহিত্যে। তাঁর হাতে আমাদের মঞ্জুভাষী কথাশিল্প হয়ে উঠল সার্বভৌম জীবনশিল্পী।" (১১১)

তারাশঙ্করের ছোটগল্পে চরিত্রাবলীর অর্থনৈতিক অবস্থাগত বিভাজন

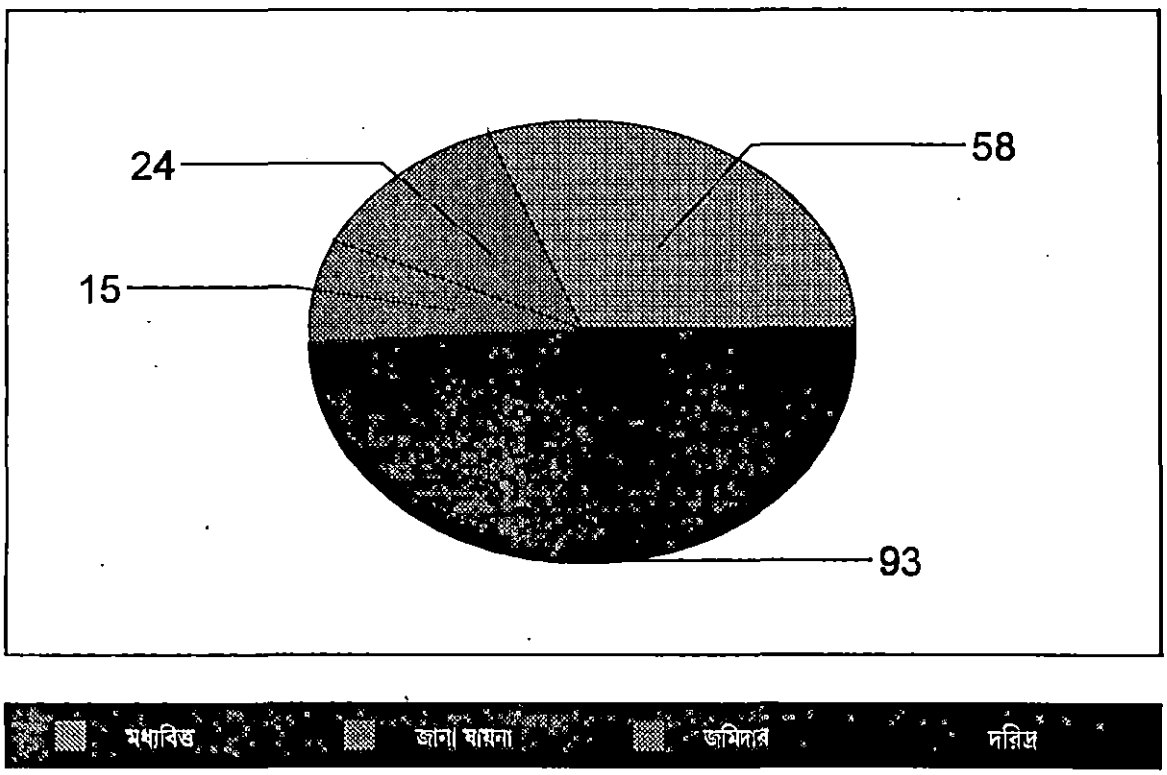

● তারাশঙ্করের ছোটগল্পগুলিতে প্রায় ৩৪টি গল্পে জমিদার বর্তমান থাকলেও প্রধান হিসেবে মূলতঃ ১৫টি গল্পে আছেন। এমন প্রায় ২৪টি গল্প রয়েছে যেখানে অর্থনৈতিক অবস্থার মাপকাঠি জানা যায় না।

● শিক্ষকতা, ভিক্ষাবৃত্তি, চৌর্যবৃত্তি, পৌরোহিত্য প্রভৃতি বৃত্তিধারী ব্যক্তিদের দরিদ্র শ্রেণীতে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। শিক্ষক ও পুরোহিতদের চরিত্রগত আদর্শ থাকতে পারে কিন্তু প্রাত্যহিক অবস্থা তাদের মোটেই ভাল ছিল না বা সমাজে কোন সম্মান ছিল না।

● লেখকের আত্মকথন, শিশুদের নিয়ে বা পশুদের নিয়ে এবং বিভিন্ন ভ্রমণমূলক গল্পগুলির অর্থনৈতিক অবস্থা জানা যায় নি।

তারাশঙ্করের ছোটগল্পে চরিত্রাবলীর শ্রেণীগত বিভাজন

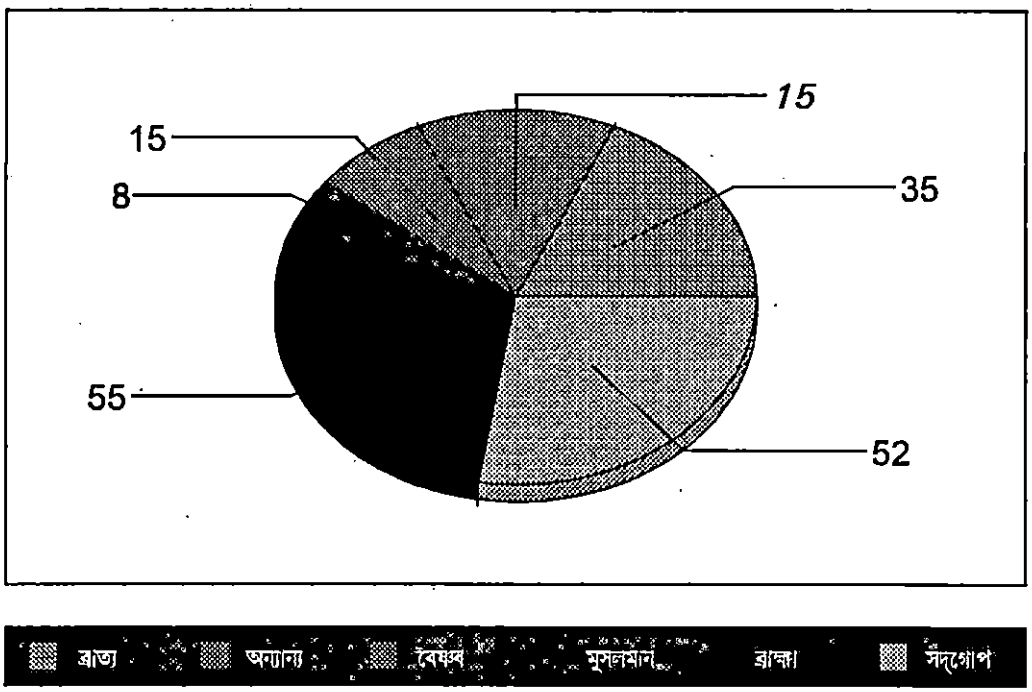

● তারাশঙ্করের ছোটগল্পের বিভিন্ন পদবীগত বিভাজন। মূলত: ব্রাহ্মণ, বৈষ্ণব, সদগোপপ, মুসলমান, ব্রাত্য শ্রেণী এবং অন্যান্য (অনেক গল্পে পদবীর উল্লেখ না থাকায় তাদের অন্যান্য হিসেব গণ্য করা হল)।

● একই গল্পে পৃথক পৃথক পদবী ধারী ব্যক্তির সন্নিবেশ আছে, তাদের পৃথক হিসেবে ধরা হয় নি, মূলত: গল্পের মুখ্য ভূমিকায় যিনি আসীন তাঁকেই ধরা হয়েছে।

● লেখকের বক্তা হিসেবে অনেক গল্প রয়েছে, যেগুলি ব্রাহ্মণ হিসেবে গণ্য করা হয় নি।

পাদটীকা ঃ-

১।	A History of Pol. Theory	:	Sabine, 3rd Edn 1963	P-213
২।	History of European Political Philosophy	:	D. R. Bhandari, 9th Edn-1967	P-109
৩।	রাষ্ট্রচিন্তার ইতিবৃত্ত	:	প্রাণগোবিন্দ দাস 2nd Edn-1988	পৃ.-৫০
৪।	Political Science	:	Gettel, 6th-1961	P-87
৫।	প্রাগুক্ত	:		P-88
৬।	শুক্রনীতি সার-অনুবাদ	:	বিনয়কুমার সরকার, প্রথম	পৃ. ৩৬৫/৭, ৩৮১-২
৭।	ভারতের সামন্ততন্ত্র	:	রামশরণ শর্মা	পৃ. ২২৩
৮।	হর্ষচরিত : অনুবাদ	:	অগ্রওয়াল	পৃ. ৪৩
৯।	হর্ষচরিত	:	অগ্রওয়ালঃ 'সামন্ত সেনামুকুট মণিময়ূরবাক্রান্তপাদার বিন্দু'	পৃ. ৪৩
১০।	মনস্মৃতি	:	অধ্যায় ৭ - শ্লোক	পৃ. ১১৫-২০
১১।	সি, য়্যু, কী	:	অনুবাদ, এস, বীল, খন্ড-১	পৃ. ৪৪
১২।	মোগল রাজত্বের ভূমিরাজস্ব পরিচালন ব্যবস্থা	:	এন, এ, সিদ্দিকী	পৃ. ১৫
১৩।	The Agrarian System of Mughal India	:	Irfan Habib	P-320
১৪।	ভারতের সামন্ততন্ত্র	:	রামশরণ শর্মা	পৃ. ১২৯
১৫।	Social Background of Indian Nationalism	:	A. R. Desai	P-38
১৬।	আমার কালের কথা (রচনাবলী ১০ম)	:	তারাশঙ্কর বন্দোপ্যাধ্যায়	পৃ. ৩৫১
১৭।	প্রাগুক্ত	:	" "	পৃ. ৩৯৩
১৮।	বাংলা সাহিত্যের ছোটগল্প ও গল্পকার	:	ভূদেব চৌধুরী	পৃ. ৪৩১
১৯।	কালি ও কলম (কয়েক প্রহরের স্মৃতি) অগ্রহায়ণ ১৩৭৮	:	গৌরাঙ্গ ভৌমিক	পৃ. ৭৯৩
২০।	"তারাশঙ্কর'	:	হরপ্রসাদ মিত্র	পৃ. ৩৭
২১।	বঙ্গ সাহিত্যে উপন্যাসের ধারা	:	ডঃ শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়	পৃ. ৫৩৪
২২।	আমার সাহিত্য জীবন ১ম খন্ড	:	তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়	পৃ. ১৫১
২৩।	গল্পপঞ্চাশৎ এর ভূমিকা	:	রথীন্দ্রনাথ রায়	পৃ. ১৫
২৪।	বাংলা গল্প বিচিত্রা	:	নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়	পৃ. ৭৮
২৫।	আমার কালের কথা	:	তারাশঙ্কর স্মৃতি কথা ১ম খন্ড	পৃ. ৬
২৬।	বাংলো গল্প বিচিত্রা	:	নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়	পৃ. ৭৯
২৭।	গল্পপঞ্চাশৎ (ভূমিকা)	:	রথীন্দ্রনাথ রায়	পৃ. ১৯
২৮।	কালিন্দী	:	তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়	পৃ. ৪১২/১৩
২৯।	V. I. Lenin, Marx, Engles: Marxism	:	Sixth English edition	P- 414 (1946)
৩০।	রায়তের কথা (বিশ্ববিদ্যাসংগ্রহ)	:	প্রমথ চৌধুরী	পৃ. ২৩

৩১।	Notes on Indian History	:	Karls Marx	P- 101
৩২।	The Story of Labour & Capital in India Vol-I-Dewan Chamanlal Cooli			P- 16
৩৩।	তারাশঙ্কর রচনাবলী-১০ম খন্ড	:	তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়	পৃ. ৩৫৪
৩৪।	কয়েক প্রহরের স্মৃতি (কালি ও কলম) তারাশঙ্কর স্মৃতি সংখ্যা	:	গৌরাঙ্গ ভৌমিক	পৃ. ৭৯৬
৩৫।	আমার সাহিত্য জীবন ১ম খন্ড	:	তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়	পৃ. ৪৮
৩৬।	Land Problem of India	:	R. K. Mukherjee	P- 90-91
৩৭।	বাংলার সামাজিক ইতিহাসের ধারা	:	বিনয় ঘোষ	পৃ. ২৭
৩৮।	কৃষকসভার ইতিহাস	:	আবদুল্লাহ্ রসুল	পৃ. ১৮
৩৯।	ভারতের বৈপ্লবিক সংগ্রামের ইতিহাস	:	সুপ্রকাশ রায়	পৃ. ৬
৪০।	History of freedom Movement in India	:	Tarachand (Vol-I)	P- 303
৪১।	ভারতের বৈপ্লবিক সংগ্রামের ইতিহাস	:	সুপ্রকাশ রায়	পৃ. ৯
৪২।	শরৎ সাহিত্য সংগ্রহ (৯ম)	:		পৃ. ৩১৫
৪৩।	India today & tomorrow	:	R. P. Dutta	P- 87
৪৪।	ধর্মকোষ	:	ভরদ্বাজ (খন্ড-১)	পৃ. ৭৩১
৪৫।	ঔপন্যাসিক তারাশঙ্কর	:	মুক্তি চৌধুরী	পৃ. ১৮
৪৬।	ভারতের বৈপ্লবিক সংগ্রামের ইতিহাস	:	সুপ্রকাশ রায়	পৃ. ৪-৫
৪৭।	India Today & Tomorrow	:	R. P. Dutta	P- 88
৪৮।	তারাশঙ্করের গল্পগুচ্ছ - ১ম খন্ড	:	জগদীশ ভট্টাচার্য	পৃ. ৫৩
৪৯।	তারাশঙ্কর : সময় ও সমাজ	:	আদিত্য মুখোপাধ্যায়	পৃ. ১০৮
৫০।	কল্লোলযুগ	:	অচিন্ত্য কুমার সেনগুপ্ত	পৃ. ১১৭
৫১।	তারাশঙ্করের শিল্পিমানস	:	নিতাই বসু	পৃ. ১৫
৫২।	আমার সাহিত্য জীবন— ২য় খন্ড	:	তারাশঙ্কর	পৃ. ৮৯
৫৩।	কালি কলম (অগ্রহায়ণ-১৩৭৮)	:	ডঃ উজ্জ্বলকুমার মজুমদার	পৃ. ৪৫৩
৫৪।	তারাশঙ্কর : সময় ও সমাজ	:	আদিত্য মুখোপাধ্যায়	পৃ. ৫৯
৫৫।	প্রাগুক্ত	:	" "	পৃ. ৯৭
৫৬।	তারাশঙ্কর	:	হরপ্রসাদ মিত্র	পৃ. ৯০
৫৭।	বঙ্গ সাহিত্যে উপন্যাসের ধারা	:	শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়	পৃ. ৫৩৩
৫৮।	তারাশঙ্কর : দেশকাল সাহিত্য	:	ডঃ উজ্জ্বলকুমার মজুমদার	পৃ. ১২৯
৫৯।	গল্প পঞ্চাশৎ এর ভূমিকা	:	রথীন্দ্রনাথ রায়	পৃ. ৫
৬০।	তারাশঙ্কর : রচনাবলী -১০ম খন্ড (মিত্র ও ঘোষ)	:		পৃ. ৩৯২
৬১।	প্রাগুক্ত	:		পৃ. ৪০৩
৬২।	লাভপুর অতুল শিব ক্লাবের স্মরণিকা	:	গজেন্দ্র কুমার মিত্র ১৯৮০	
৬৩।	বাংলা সাহিত্যের সম্পূর্ণ ইতিবৃত্ত	:	অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়	পৃ. ৭০৫
৬৪।	গল্পপঞ্চাশৎ এর ভূমিকা	:	রথীন্দ্রনাথ রায়	পৃ. ৫

৬৫।	বাংলা গল্প বিচিত্রা	:	নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়	পৃ. ১২২
৬৬।	তারাশঙ্কর : রচনাবলী ১০ খন্ড	:	মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স	পৃ. ৩৮৩
৬৭।	প্রাগুক্ত	:		পৃ. ৩৮৫
৬৮।	তারাশঙ্কর : ও রাঢ়ের লোক সংস্কৃতি (কালি ও কলম)	:	আশুতোষ ভট্টাচার্য	পৃ. ৫৪২
৬৯।	তারাশঙ্কর : রচনাবলী ১০ খন্ড	:	মিত্র ও ঘোষ	পৃ. ৩৮৪
৭০।	প্রাগুক্ত	:		পৃ. ৩৮২
৭১।	আমার কথা (শনিবারের চিঠি) (১৩৭১)	:	তারাশঙ্কর	পৃ. ৮৮
৭২।	তারা : সময় ও সমাজ	:	আদিত্য মুখোপাধ্যায়	পৃ. ৬৫
৭৩।	পশ্চিমবঙ্গের সংস্কৃতি	:	বিনয় ঘোষ	পৃ. ৭০
৭৪।	প্রাগুক্ত	:		পৃ. ৭২
৭৫।	বাংলা সাহিত্যের ছোটগল্প ও গল্পকার	:	ভূদেব চৌধুরী	পৃ. ৫৩৪
৭৬।	বাংলা সাহিত্যের সম্পূর্ণ ইতিবৃত্ত	:	অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়	পৃ. ৭০৫-৬
৭৭।	তারাশঙ্করের গল্পগুচ্ছ ১ম খন্ড	:	জগদীশ ভট্টাচার্য	পৃ. ৬১
৭৮।	বাংলা গল্প বিচিত্রা	:	নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়	পৃ. ১২৩
৭৯।	প্রাগুক্ত	:		পৃ. ১২৩
৮০।	শ্রেষ্ঠ গল্পের ভূমিকা	:	জগদীশ ভট্টাচার্য	পৃ. ১৭
৮১।	বাংলা গল্প বিচিত্রা	:	নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়	পৃ. ১২৩
৮২।	The Tribes & Castes of Bengal	:	H. H. Risley Vol-I	P- 38
৮৩।	সূত্র প্রাগুক্ত	:		P- 16
৮৪।	প্রাগুক্ত	:		P- 78
৮৫।	প্রাগুক্ত	:	Volume-2	P- 22-24
৮৬।	প্রাগুক্ত	:	Volume-1	P- 507
৮৭।	প্রাগুক্ত	:	Volume-2	P- 96
৮৮।	প্রাগুক্ত	:	Volume-2	P- 47
৮৯।	প্রাগুক্ত	:	Volume-2	P- 225-34
৯০।	পশ্চিমবঙ্গের সংস্কৃতি	:	বিনয় ঘোষ	পৃ. ১২৪
৯১।	মার্ক ব্ল্যাক ফিউডাল সোসাইটি পৃ. ৭৩	:	সূত্র ভারতের সামন্ততন্ত্র : রামশরণ শর্মা	পৃ. ৪৩
৯২।	ভারতের সামন্ততন্ত্র	:	রামশরণ শর্মা	পৃ. ২২৪
৯৩।	ভারতের কৃষক বিদ্রোহ ও গণতান্ত্রিক সংগ্রাম	:	সুপ্রকাশ রায়	পৃ. ৬
৯৪।	Social Back Ground of Indian Nationalism	:	A. R. Desai	P- 177
৯৫।	ভারতের কৃষক বিদ্রোহ ও গণতান্ত্রিক সংগ্রাম	:	সুপ্রকাশ রায়	পৃ. ১৪৪
৯৬।	Annals of Rural Bengal	:	W. W. Hunter Vol-I	P- 218
৯৭।	Transactions in india (1786)	:	Young Husband	P- 123-24.

৯৮।	ভারতের কৃষক বিদ্রোহ ও গণতান্ত্রিক সংগ্রাম	: সুপ্রকাশ রায়	পৃ. ১৬
৯৯।	বঙ্গদেশের কৃষক	: বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়	পৃ. ৭০
১০০।	Consideration of Indian Affairs	: William Bolts	P- 63
১০১।	A quote from Karl Marks' Capital	: G. Allen & Unwin, Vol-I	P- 432
১০২।	ভারতের কৃষক বিদ্রোহ ও গণতান্ত্রিক সংগ্রাম	: সুপ্রকাশ রায়	পৃ. ৬৫
১০৩।	Economic History of Bengal	: N. K. Sinha Vol-I	P- 169
১০৪।	দেশের কথা	: সখারাম গণেশ দেউস্কর	পৃ. ২৭
১০৫।	Starving Millions	: S. K. Chatterjee	P- 12
১০৬।	ভারতের বৈপ্লবিক সংগ্রামের ইতিহাস	: সুপ্রকাশ রায়	পৃ. ৭
১০৭।	Amrita Bazar Patrika	: 22nd May 1874	
১০৮।	ভারতের বৈপ্লবিক সংগ্রামের ইতিহাস	: সুপ্রকাশ রায়	পৃ. ২০
১০৯।	উত্তরবঙ্গের আধিয়ার বিদ্রোহ ও তেভাগা আন্দোলন	: ধনঞ্জয় রায়	পৃ. ১৪৪
১১০।	তারাশঙ্করের গল্পগুচ্ছ ৩য় খন্ড	: জগদীশ ভট্টাচার্য	পৃ. ৩৪
১১১।	তারাশঙ্কর বিচিত্রা	: বিশ্বনাথ দে (সম্পাদিত)	পৃ. ২৮

* * * * * * * * * * * * * * *